কেরিয়ার গাইড : ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস | শিবতোষ ঘোষের সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ) | উইম্বলডন সেরা গ্র্যান্ড স্লাম

৫ জুলাই ১৯৯৫ আনন্দবাজার প্রকাশন পনেরো টাকা

আনন্দমেলা

উত্তাপে, বিস্ফোরণে কিংবা খুব উঁচু থেকে মাটিতে পড়েও উড়োজাহাজের ভেতরে থাকা ব্ল্যাক বক্সের ক্ষতি হয় না। ২০০০ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপে ব্ল্যাক বক্সকে ঘন্টার পর ঘন্টা ফেলে রাখা হয়। ব্ল্যাক বক্স ২০,০০০ ফুট জলের নীচে ডুবে থাকলেও তার শব্দতরঙ্গ এক মাস ধরে প্রায় আড়াই মাইল দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। কী করে সম্ভব হয় এই অসম্ভব ঘটনা? সত্যিই আমাদের চমকে দেয় এই

ব্ল্যাক বক্স রহস্য

এলো এই
প্যারাসুট
উত্তম
বিশুদ্ধতার
টাটকা
সুগন্ধ
Parachute®
Uttam
COCONUT OIL
FRESH AROMA OF PURITY
এ নারকোল তেল এত বিশুদ্ধ এমনকি আপনার নাকও মানবে।
S S C & B *PCNO *261 *2027 *BG

আনন্দমেলা

২১ বর্ষ ৬ সংখ্যা ২০ আষাঢ় ১৪০২ ৫ জুলাই ১৯৯৫

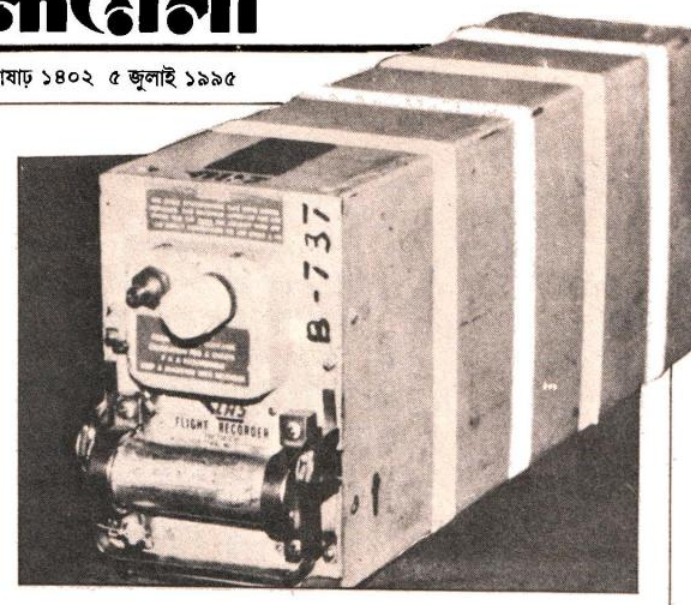

১১ ব্ল্যাক বক্স রহস্য

যান্ত্রিক গোলযোগে কিংবা বৈমানিকের মুহূর্তের অসতর্কতায় ঘটে যেতে পারে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা। কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটলে তার কারণ জানতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে বিমানটির ব্ল্যাক বক্স। ব্ল্যাক বক্সের মধ্যেই ধরা থাকে নিকটতম বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের সঙ্গে পাইলটের কথোপকথনের রেকর্ড করা টেপ। ব্ল্যাক বক্সের সাহায্যে কীভাবে বিশেষজ্ঞরা খুঁজে বের করেন দুর্ঘটনার কারণ ? এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে ব্ল্যাক বক্সের নানা খবরাখবর নিয়ে লিখেছেন চঞ্চল পাল। কয়েকটি ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে লিখেছেন অভীক ভট্টাচার্য।

৫২ পরিবেশ প্রসঙ্গে

১৯৭২ সালের পাঁচ জুন সারা পৃথিবীজুড়ে প্রথম পালিত হয়েছিল বিশ্ব পরিবেশদিবস। সেদিন মানুষ প্রথম সম্মিলিতভাবে শুরু করেছিল পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন। সেই থেকে প্রতি বছরই এই বিশেষ দিনটিতে পালিত হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। লিখেছেন রতনতনু ঘাটী।

৯০ উইম্বলডন

ফ্রেঞ্চ ওপেন টেনিস টুর্নামেন্ট শেষ হতে না হতেই এসে গেল উইম্বলডন। টেনিসের সবচেয়ে সম্মানজনক প্রতিযোগিতা উইম্বলডনে প্রতিবারের মতো এবারও হবে জোর লড়াই। টেনিস-তারকাদের মধ্যে কে কে এবার চমক দেখাতে পারেন উইম্বলডনে ? লিখেছেন সুমন ভট্টাচার্য।

এ ছা ড়া ও

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

ফুলে বিষের গন্ধ সমরেশ মজুমদার ৬

পাণ্ডব গোয়েন্দা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৭১

গ ল্প

রক্তমন্দিরের রত্নরশ্মি অদ্রীশ বর্ধন ৩২

লঙ্কাকাণ্ড রমেন দাস ৫৬

ইশ্‌র মালটোর পুঁথি গৌরী সেন ৬০

স ম্পূ র্ণ উ প ন্যা স (প্র থ মা ং শ)

পরমপ্রিয় শিবতোষ ঘোষ ৭৪

বি জ্ঞা ন বি চি ত্রা

কলকাতায় তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞাননগরী সুমা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮

কে রি য়া র গা ই ড

ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস অমর দাশ ৪০

বি শ্ব বি চি ত্রা

জাপানি কুকুরের কদর বাড়ছে বিদেশে আশিস সরকার ৪৭

ক বি তা

সেই বয়সটা গৌতম হাজরা ৭৮

খে লা ধু লো

কার পোস্টার ৬৭

মিয়াঁদাদ খেললে...হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৮৭

খেলার খবর ৯৩

নি য় মি ত ক মি ক্‌ স

আর্চি ৩১, ৬৬ **টিনটিন** ৩৪ **অরণ্যদেব** ৩৮ **ডাঃ রেক্স মর্গান** ৪২ **অ্যাসটেরিক্স ও সোনার কাস্তে** ৪৬ **গ্রহের নাম** **অ্যালফ্রোলল** ৫৪ **জন পাম্পের উত্তরাধিকার** ৫৮ **গাবলু** ৬২

নি য় মি ত বি ভা গ

চিঠিচাপাটি ৫ **কুইজ** ২৯ **বইয়ের খবর** ৪৫ **হাসিখুশি** ৭২ **শব্দসন্ধান** ৭৬ **নানারকম** ৮২ **বিজ্ঞান : গবেষণা** ৮৬

প্র চ্ছ দ

অনুপ রায়

আগামী আকর্ষণ

প্রচ্ছদকাহিনী : আশ্চর্য হিরে কোহিনুর

ঐতিহাসিক কোহিনুর মণি নিয়ে গত ২৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলেছে নানা নাটকীয় টানাপোড়েন। একের পর এক হাতবদল হতে হতে এই আশ্চর্য হিরে ১৮৫০ সালে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ডে। আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনীতে থাকছে কোহিনুরের নানা চাঞ্চল্যকর খবর।

স ম্পা দ ক

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দাম ১৫ টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা

উত্তর-পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

দীর্ঘ দিন পরেও এর গুণ জলের মত
তাই খারাপ জিনিষ নিয়ে ঝামেলায় পড়বেন কেন?

টি-প্লাস বা তিন গুণ পুরু কোটিং যোগায় তৃপ্তি। এর জন্যই নন্-স্টিক বছরের পর বছর নন্-স্টিকই থাকে। বিদেশ থেকে আমদানী করা নন্-স্টিক সমগ্র ভারতের রান্নার জন্যে বিশেষভাবে গড়ে নেওয়া হয়, এটি তাওয়ার ওপর শুকনো-তাপের ধকল বেশি ভাল সইতে পারে। সস্প্যান আর ফ্রাইপ্যানে এটি মশলা আর বেশী-তেলে ভাজার ধকলও সুন্দর সইতে পারে। যা-ই রাঁধুন না কেন - তৃপ্তির টি-প্লাস নন্-স্টিক থাকে বছরের পর বছর। তাই অন্য কিছু নেবার ঝুঁকি নিতে যাবেন কেন? যে-নন্-স্টিক অনেক বছর এগিয়ে আছে সেই তৃপ্তি টি-প্লাস সুবিধার ওপরই ভরসা রাখুন

আমিও তৃপ্তির
টি-প্লাস-ই
নিয়েছি।

রান্নার নন্-স্টিক বাসন তৈরির ব্যাপারে ১৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা।

বিনামূল্যে পুস্তিকার জন্য লিখুন

* ট্রেড মার্ক

তৃপ্তি আসল নন্-স্টিক রান্নার

তৃপ্তি সি-৪৩,

কাজে লেগেছে কেরিয়ার গাইড

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের সুখ্যাতি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের ভাল ছাত্রছাত্রীরা শুধু নয়, বিদেশের ছাত্রছাত্রীরাও এখন পড়তে আসছেন এখানে। 'আনন্দমেলা'র ২৯ মার্চ সংখ্যায় জে.এন.ইউ-এর বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির খবরাখবর তাই খুবই সময়োপযোগী।

■ **সন্তোষ দেবনাথ**
পার্কসার্কাস, কলকাতা

সেরা ফুটবলার বাইচুং

'আনন্দমেলা'র ১২ এপ্রিল সংখ্যায় 'বাইচুং এখন ভারতের সেরা ফুটবলার' লেখাটি মন ভরিয়ে

ফোটো : অভিজিৎ পাল

[illegible] তরুণ এই ফুটবলারটি ভারতীয় ফুটবলে নতুন আশা। সাক্ষাৎকারভিত্তিক এই লেখাটিতে ফুটবলার বাইচুং-এর ছেলেবেলার কথা জানতে পেরে খুবই ভাল লেগেছে

■ **শীর্ষনাথ বসু চৌধুরী**
তারকেশ্বর, হুগলি

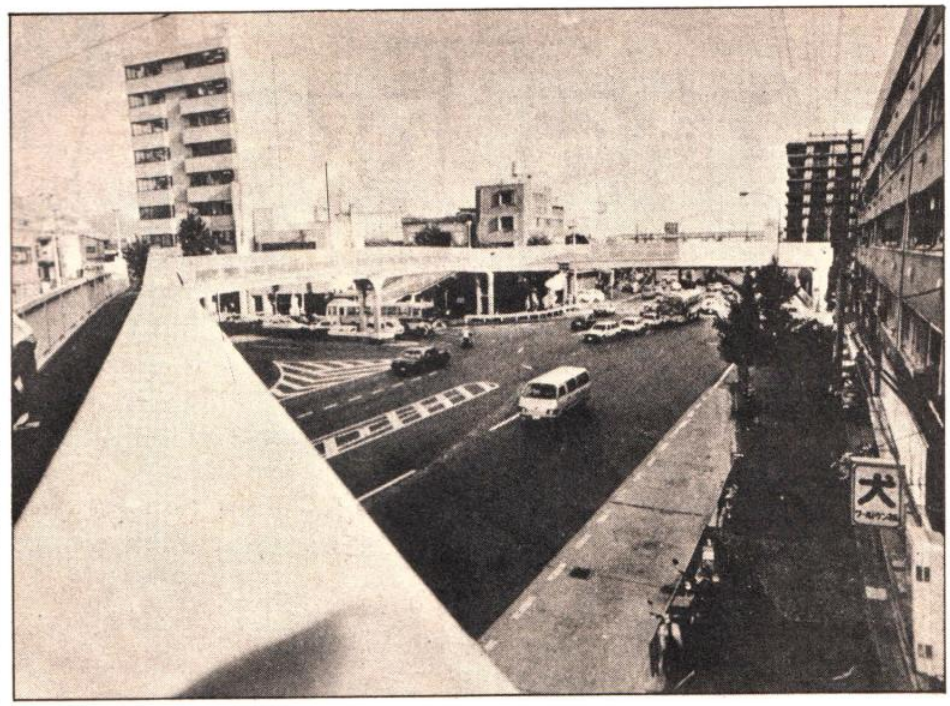

আগামী দিনে কেমন হবে মেগাসিটিগুলির চেহারা

আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলির একটি হল জনবিস্ফোরণ। পৃথিবীর নানা দেশে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা বিপুল হারে বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে বড়-বড় শহরের আয়তন। বিশ্বের কোথায়-কোথায় আছে মেগাসিটি, কী এই শহরগুলির বৈশিষ্ট্য, বেড়ে চলা জনসংখ্যার চাপ আগামী দিনে কোথায় পৌঁছে দেবে মেগাসিটিগুলিকে, তার সুন্দর আলোচনা পড়লাম 'আনন্দমেলা' পত্রিকার ১২ এপ্রিল সংখ্যায়। কাকে বলে মেগাসিটি, জিওট্রাপলিস-ই বা কী, ইত্যাদি বিষয়ে পেলাম নতুন নানা তথ্য। সঙ্গের ছবিগুলিও খুব ভাল। আর ভাল লাগল বিশ্বের কয়েকটি বড় শহরের খবর। আনন্দমেলার 'ঐতিহাসিক শহর' সংখ্যার মতো এই সংখ্যাটিও সংগ্রহযোগ্য।

■ **দেবপ্রতিম ঘোষ**
কোন্নগর, হুগলি

কম্পিউটারের নতুন বিস্ময়

সাইবারস্পেস বা কল্পবাস্তব সম্পর্কে আগে থেকেই কিছু-কিছু তথ্য জানা ছিল। কিন্তু 'আনন্দমেলা'র ২৯ মার্চ সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী থেকে কম্পিউটারের এই নতুন বিস্ময় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলাম। আধুনিক কম্পিউটার-প্রযুক্তির দৌলতে মানুষ আজ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। সাইবারস্পেস প্রযুক্তির সাহায্যে এবার কল্পনা ও বাস্তবের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলেন বিজ্ঞানীরা। এই প্রযুক্তিতে দর্শকও জড়িয়ে পড়বেন ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, তাঁরা নিজেরাও হয়ে উঠবেন ঘটনারই অঙ্গ। আক্ষরিক অর্থে বাস্তব না হলেও ঘটনাগুলি বাস্তবের বিভ্রম জাগিয়ে তুলবে মনে। সাইবারস্পেস প্রযুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা খুবই সময়োপযোগী। এরকম আকর্ষক একটি প্রচ্ছদকাহিনী উপহার দেওয়ার জন্য 'আনন্দমেলা' কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে কল্পবাস্তব নিয়ে আরও লেখা প্রকাশিত হলে খুব ভাল লাগবে।

■ **মহম্মদ আশিক ইকবাল**
স্টেশন রোড, মেদিনীপুর

ধারাবাহিক উপন্যাস

ফুলে বিষের গন্ধ

সমরেশ মজুমদার

তেরো

ডুয়ার্সের বৃষ্টি সম্পর্কে পন্ডিতরাও কোনও পূর্বাভাস দিতে পারেন না। ওরা যখন আজ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছিল, তখন আকাশ পরিষ্কার। গাছপালা এখনও ভেজা কিন্তু পায়ের তলায় জল জমেনি। সুন্দর আগে-আগে যাচ্ছিল।

বাংলো থেকে ওরা একসঙ্গে জঙ্গলে ঢোকেনি। মেজর এবং অর্জুন যেমন বেড়াতে যায় তেমনই একটু আগেভাগে বেরিয়েছিল। নুড়ির রাস্তাটা ধরে কিছুটা এগিয়ে ওরা জঙ্গলে পা রেখেছিল। অমল সোম এসেছিলেন মিনিটদশেক পরে। প্রত্যেকেই সঙ্গে একটা ব্যাগ অথবা প্যাকেট নিয়ে এসেছে। তাতে দু-একদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে। মেজর বেশ উত্তেজিত। সুন্দরের কথা তিনি জানতেন না। একটু আগে অর্জুনের মুখে সব শুনে মাথা নাড়লেন, "মুশকিলে ফেললে আমাকে!"

"কেন?" অর্জুন বুঝতে পারল না।

"যেভাবেই হোক একবার না একবার ওই সুন্দরের মাথায় মারতে হবে আমাকে। মার খেয়ে হজম করে যাচ্ছিলাম কে মেরেছে জানি না বলে। জানার পর বদলা না নিলে নিজেকেই অসম্মান করব।"

"অসম্মান?"

"হ্যাঁ, মনে হবে আমি খুব ফালতু, শক্তিহীন, মুখ বুজে মার খেয়ে যাই।"

"কিন্তু সুন্দর তো জেনেশুনে আপনাকে মারেনি। অন্ধকার জঙ্গলে আপনাকে শত্রু ভেবে সে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। পরে আপনার জ্ঞানহীন শরীরটাকে পাহারা দিয়েছে। আমরা আপনাকে খুঁজতে গেলে সে-ই জায়গাটা চিনিয়ে দিয়েছে। এটা ভাবুন।"

মাথা নাড়লেন মেজর, "সব ঠিক, কিন্তু... ! দেখি!"

শেষপর্যন্ত বিকেল হয়ে এল। মাঝে-মাঝে জঙ্গল এত ঘন যে, চলতে অসুবিধে হচ্ছিল। তবে ভুটানের পাহাড় কাছে এসে পড়েছে, চোখেই দেখা যাচ্ছে। অমল সোম সুন্দরের সঙ্গে তাল রেখে চলছিলেন। অর্জুন তাদের পায়ে-পায়ে, মেজর মাঝে-মাঝেই পিছিয়ে পড়ছেন। তাঁর পিছিয়ে পড়ার কারণ নাকি বুটজোড়া। ওটা তিনি আফ্রিকার জঙ্গলে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতেন। আজ জঙ্গলে অভিযান জেনে পায়ে গলিয়েছিলেন কিন্তু ডুয়ার্সের জঙ্গলে যে আফ্রিকার জিনিস অচল, তা জানতেন না।

অর্জুন লক্ষ করছিল এতটা দূর জঙ্গল ভেঙে আসতে তেমন কোনও বন্য প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়নি। কয়েকটা বনমুরগি, খরগোশ এবং দুটো শেয়াল ছাড়া কেউ ওদের সামনে আসেনি। গতকালের বৃষ্টির জন্য আজ ওরা যে যার গর্তে লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে! কিন্তু উলটোটাও তো হওয়া উচিত

অমল সোম বললেন, "দিন শেষ হওয়ার আগে আমরা যতটা সম্ভব পাহাড়ের কাছাকাছি চলে যেতে চাই। এসব জায়গায় রাত কাটানো মোটেই আরামদায়ক হবে না।"

সুন্দর বলল, "সাহেব ঠিক বলেছেন। তা ছাড়া রাত্রে বৃষ্টিতে ভেজা খুব কষ্টের।"

মেজর চোখ বড় করলেন, "আকাশ দেখে মনে হচ্ছে না তিনদিনের মধ্যে বৃষ্টি হবে। তবে আপনি যখন বলছেন মিস্টার সোম তখন আমাদের হাঁটতে হবেই।"

"আপনি কি টায়ার্ড ?"

"টায়ার্ড আমি কখনও হই না, একটু খিদে-খিদে ভাব হয়েছে এই যা।"

অমল সোম তাঁর ব্যাগে হাত ঢোকালেন। ব্যাগটা বেশ ভারী। তা থেকে একটা বিস্কুটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে দিলেন, "খেয়ে নিন।"

"আমি একা খাব কি !" মেজর লজ্জিত হলেন।

"যার-যার খিদে পেয়েছে, খাবে। জঙ্গলে সঙ্কোচের কোনও মূল্য নেই। নিজেকে সুস্থ রাখাই বড় কথা।" বিস্কুটের প্যাকেটের মুখ খুলে নিজে একটা নিয়ে মেজরের হাতে ধরিয়ে দিলেন। দেখা গেল খিদে কারও কম পায়নি।

খানিকটা এগোতেই গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। সম্ভবত ট্রাক চলছে। অমল সোম তাকালেন সুন্দরের দিকে, "এদিকে মোটরের রাস্তা আছে নাকি ?"

"মাটির রাস্তা। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লরি চলে।"

"কতদূর গিয়েছে ?"

"আমি দেখিনি।"

"চলো, একবার দেখা যাক, ট্রাকে কী যাচ্ছে ?"

শর্টকাট পথ করে ওরা মিনিটপাঁচেক যেতেই রাস্তাটাকে দেখতে পেল। বোঝাই যাচ্ছে ওই রাস্তা সচরাচর ব্যবহার করা হয় না। তারপরেই এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। দেখা গেল একটা খালি ট্রাক ফিরে যাচ্ছে। ড্রাইভার এবং খালাসি ছাড়া গাড়িতে কেউ নেই।

অমল সোম নিচু স্বরে বললেন, "খালি ট্রাক ফিরে যাচ্ছে। ওদের তো কাঠ বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার কথা। এমনি বেড়াতে নিশ্চয়ই আসেনি।"

অর্জুন বলল, "কোনও জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল হয়তো !"

"হ্যাঁ। কোথায় গিয়েছিল ?"

"দৌড়ে গেলে ট্রাকটাকে ধরা যায়।"

"নাঃ। তাতে কিছু লাভ হবে না। উলটে আমাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দেওয়া হবে। চলো।"

মেজর চুপচাপ শুনছিলেন, "আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না।"

"কী ?" অমল সোম তাকালেন।

"এইরকম একটা রাস্তা থাকতে আমরা এত কষ্ট করে জঙ্গল ভেঙে এলাম কেন ? একটা ট্রাক বা জিপ ভাড়া করে অনেক কম সময়ে চলে

আসতে পারতাম।"

"পারতাম, যদি রাস্তাটার কথা জানা থাকত। জঙ্গলের ম্যাপে এই রাস্তাটার কোনও হদিস নেই। ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং। অবশ্য থাকলেও ওই রাস্তা না ব্যবহার করে আমরা ভাল করেছি। মেজর, কষ্ট করলেও তো কেষ্ট মেলে। চলুন।"

একটু আগেও ওরা খোলামনে হাঁটছিল। অর্জুন গুন্‌গুন করে গানও গেয়েছে। কিন্তু ওরা নিঃশব্দে সতর্ক-পায়ে হাঁটছিল। ভুটানের পাহাড়ের প্রায় গায়ে পৌঁছতেই অন্ধকার নেমে এল জঙ্গলে। সুন্দর চটপট তল্লাশি করে একটা জায়গা বাছল। সমতল থেকে জঙ্গল উঠে গেছে পাহাড়ে। ভুটান এবং ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও দেওয়াল বা কাঁটাতারের বেড়া নেই। এ-দেশের জীব ওদেশে চলে যাচ্ছে পাশপোর্ট ছাড়াই। পাহাড়ের নীচে একটা চওড়া পাথর পড়ে ছিল। পাথরটার ওপরের দিক বেশ মসৃণ। ফুটদশেক হবে পাথরটা। মাথার ওপর একটা ঝাঁকড়া গাছ আছে।

অমল সোমেরও পছন্দ হল পাথরটা। রাত্রিবাসের পক্ষে ভালই। অল্প বৃষ্টি হলে গাছ তাদের রক্ষা করবে, আবার মাটিতে ঘোরা জীবজন্তু সহজে নাগাল পাবে না। তিনি মেজরকে বললেন, "প্রাকৃতিক কাজকর্ম সেরে উঠে পড়ুন ওপরে।"

মেজর বললেন, "আগে জানলে তাঁবু সঙ্গে আনতাম।"

অর্জুন বলল, "সেটা আনলে মন্দ হত না। তাঁবুতে থাকা একটা দারুণ ব্যাপার!"

মেজর বললেন, "তোমাকে নিয়ে একবার আফ্রিকায় যাব। দেখবে কী থ্রিল।"

ওপরে উঠতে মেজরের একটু কষ্ট হল। ভারী শরীরটাকে টানা-হ্যাঁচড়া করে তুলতে অর্জুনের সাহায্য নিতে হল। ওঠার পর হাতপায়ের জড়তা ছাড়াতে কয়েকবার শূন্যে ছুড়ে বললেন, "ফ্যান্টাস্টিক। শুধু যদি চাঁদ উঠত আজ রাত্রে।"

অর্জুন দেখল আকাশের নীল এখন হারিয়ে যাচ্ছে। পাতলা মেঘের আস্তরণ ছড়াতে শুরু করেছে। বৃষ্টি যতক্ষণ না থামছে ততক্ষণ এই পাথরের বিছানা বেশ আরামদায়ক। নীচে একটা আড়াল দেখে আগুন জ্বালিয়েছে সুন্দর। অমল সোমের সঙ্গে তর্ক চলছে তার। অর্জুন পাথরের ধারে এসে কান পাতল। সুন্দর বলছে, "সাহেব, আপনি আমাকে আধঘণ্টা সময় দিন, আমি চারটে মুরগি ধরে আনছি। এই মুরগিগুলো রাত্রে ভাল দেখতে পায় না। এদিকে মানুষজন আসে না বলে ওদের পেতে অসুবিধে হবে না।"

অমল সোম বললেন, "কোনও দরকার নেই। আমার সঙ্গে ড্রাই ফুডের কৌটো রয়েছে। টিনফিশের কৌটো খুলে একটু গরম করে নিলে দিব্যি চলে যাবে। সঙ্গে একটু কফি করে নেওয়া যাক।"

অর্জুন বলল, "অমলদা, ও যখন বলছে ধরে আনতে পারবে, তখন টিনফিশগুলো কালকের জন্যে থাকলে মন্দ হয় না!"

অমল সোম ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রাণী-হত্যা করতে চাও?"

"বাংলোয় বসেও তো আমরা মুরগি খেয়েছি।"

"ঠিক আছে। একটু কফি খেয়ে নেওয়া যাক।"

অমলদার ব্যাগে যে কফি বানাবার সরঞ্জাম ছিল, অর্জুন জানত না। প্লাস্টিকের গ্লাসে লাল গরম কফি খুব ভাল লাগল। আগুন নিভিয়ে দিয়ে নিজের ঝোলা নিয়ে সুন্দর ঢুকে গেল জঙ্গলে। অমল সোম পাথরের ওপরে উঠে এলেন, "জায়গাটা দেখছি ভালই।"

শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা ফেলে দিতে গিয়ে সামলে নিলেন মেজর। পাশে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা ঠিক কিসের অভিযানে এসেছি মিস্টার সোম?"

"এটাকে কি অভিযান বলা যায়!"

"তো কী? জঙ্গলে রাত কাটানো, মাইলের পর মাইল হাঁটা। আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনি কিন্তু বিষাক্ত ফুল খুঁজতে আমাকে সাহায্য করছেন না।"

"কীভাবে করব সেটাই তো বুঝতে পারছি না। প্রথম কথা, এখানে কেউ বলল না ওরকম ফুলের কথা আগে শুনেছে। জঙ্গলে তো অনেক ঘোরাঘুরি হল, সেইরকম ফুলের অস্তিত্ব নজরে পড়ল না। আমার মনে হয় কেউ মনগড়া গল্প প্রচার করেছে।"

"তার কী লাভ?" মেজর প্রতিবাদ করলেন।

"গুজব যারা ছড়ায় তারা কি সবসময় নিজের লাভের কথা চিন্তা করে?"

"আমি কিন্তু এত সহজে ছাড়ছি না। সমস্ত পৃথিবীর লোক ভগবান ভগবান করে মরছে, ভগবানকে কেউ চোখে দ্যাখেনি বলে সেটাকে মিথ্যে বলে বাদ দিচ্ছে না তো!"

"ভয়ে।"

"ভয়ে, মানে?"

"ভগবান না থাকলে মানুষের আর কিছুই থাকবে না।"

মেজর গুম মেরে গেলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমরা ক'দিন জঙ্গলে থাকব?"

"কালই ফিরে যেতে পারি। আমি একটা সেরাও ধরতে চাই।"

"সেরাও?" মেজর অবাক হলেন।

"হ্যাঁ। পাহাড়ি ছাগল। খুব বিরল প্রজাতির। ওর আঞ্চলিক নাম সের। যেহেতু ওরা আমাদের বনাঞ্চলে খুব কম আসে, তাই বনবিভাগ সরাসরি কিছু করতে পারছে না। ওরা সাধারণত ভুটানের পাহাড়ের নীচের দিকে ঘোরাফেরা করে। হঠাৎ এই নিরীহ প্রাণীটির চাহিদা পশ্চিমের বাজারে বেড়ে গিয়েছে। ফলে আমাদের দেশের লোভী মানুষেরা আরও বড়লোক হওয়ার লোভে মেতে উঠেছে। ভুটানের রাজাও চাইছেন ওদের রক্ষা করতে কিন্তু ওদের সংখ্যা কত, ঠিক কোথায় থাকে, তাও কারও জানা নেই। আর জায়গাটা যেহেতু দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চল, তাই বিধিনিষেধের বেড়া টপকে মুশকিল হয়ে গিয়েছে। আমি, যদি কপালে থাকে, একটা সেরাও ধরব। তারপর তাদের দলের সন্ধান পেতে অসুবিধে হবে না।" অমল সোম বললেন।

অর্জুন বলল, "ওদের তো অনেক দল থাকতে পারে।"

"অনেক হলে তো সংখ্যায় ভারী হবে। দল কত তা জানা যাচ্ছে না।"

"আপনাকে কী করতে হবে?"

"একটা রিপোর্ট দিতে হবে। সেরাওদের কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় এবং চোরাশিকারিদের হাত থেকে বাঁচানোর উপায় কী তা জানাতে হবে সরকারকে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা যখন সরকারি তখন তো আপনি প্রকাশ্যে দলবল নিয়ে আসতে পারতেন। এই রিপোর্ট দুটোর জন্যে গোপনীয়তার কোনও দরকার ছিল কি?"

"ছিল। প্রথমত..." অমল সোম থেমে গেলেন। জঙ্গলে তখন গভীর অন্ধকার নেমে গেছে। কিন্তু তার মধ্যেই অজস্র জোনাকি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে। পাখিরাও চুপ করে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু মাঝে মাঝেই অদ্ভুত ডাক ভেসে আসছে। এই ডাক কোনও পরিচিত জানোয়ারের নয়। কীরকম গা ছমছম হয়ে উঠছিল পরিবেশ।

হঠাৎ মেজর ফিসফিস করে বলে উঠলেন, "ল্যাঙ্গো।"

"সেটা কী জিনিস?" অর্জুন জানতে চাইল।

"অদ্ভুত জীব। একে আমি দেখেছি ব্রাজিলে। ডুয়ার্সে এ এল কী করে?"

"কীরকম দেখতে?"

"শেয়াল, হায়েনা, নেকড়ে পাঞ্চ করলে যেমন দাঁড়ায়, মুখটা কিছুটা বুলডগের মতো।"

"বুনো কুকুর?"

"তা বলতে পারো। খুব হিংস্র হয়। বড় দলে থাকলে বাঘও ওদের এড়িয়ে চলে। চোয়াল খুব শক্ত। এই পাথরের ওপর লাফিয়ে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না।"

অমল সোম বললেন, "আপনার কলমটাকে হাতের কাছে রাখুন। দরকার হলে পুড়িয়ে দেবেন। একটা পুড়লে আর কেউ আসবে না।"

ল্যাঙ্গো ডেকে যাচ্ছিল। বেশ করুণ ডাক। সম্ভবত সঙ্গীদের সন্ধান করছে। অর্জুনের মনে হল রাত না নামতে জঙ্গল রহস্যময় হয় না। কিন্তু সুন্দর তো এখনও ফেরেনি। সে যদি ওই ল্যাঙ্গোর সামনে পড়ে? তার মনে অস্বস্তি ঢুকল।

অমল সোম বললেন, "হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম। প্রথমত, সরকারি দল আমাকে ইচ্ছেমতন সেরাও দেখাতে পারত না। ওরা জনপদ এড়িয়ে চলে। দুই, চোরাশিকারিরা আমাদের অস্তিত্ব জেনে যেতই এবং নিজেদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ রাখত। তাই আমি এখানে এসে একজন লোকাল লোকের খোঁজ করছিলাম, যে কখনও সেরাও দেখেছে। ডি এফ ও বলেছিলেন হদিস দেবেন। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত সেরকম কারও সন্ধান তিনি পাননি। তখন ভাবলাম নিজেরাই জঙ্গলে ঘুরব। এই সময় তোমার সুন্দরবাবুর খবর পেলাম।"

"এই চোরাশিকারিদের, যারা সেরাও এক্সপোর্ট করতে পারে তাদের সন্ধান পেয়েছেন?"

"না। অনুমানের ওপর নির্ভর করে আমি কখনও সিদ্ধান্ত নিইনি।"

"তা হলে সুন্দরকে পেয়ে আমাদের লাভ হয়েছে, বলুন।"

"অবশ্যই।"

"সুন্দর পাখি ধরত, বিক্রি করত। আমার কথা শোনার পর লোকটার মধ্যে সত্যি পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু নীলবাবু ওকে অন্য একটি কাজের দায়িত্ব দিলেন। ওকে সেরাও ধরতে হবে। বুঝতেই পারছেন বিদেশে সেরাও এক্সপোর্ট করা নীলবাবুর পক্ষে সম্ভব।"

"এসব হয়তো সত্যি, কিন্তু প্রমাণ করতে পারবে না। সুন্দর যে বানিয়ে বলছে না, তারই বা প্রমাণ কী? কোনও অন্যায় করে ও হয়তো জঙ্গলে লুকিয়ে আছে।"

"কার কাছে অন্যায় করবে?"

"আমি জানি না। শুধু বলতে চাইছি প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছু, কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না।" অমল সোম চুপ করতেই পাতার শব্দ হল। মেজর হাত উঁচু করলেন। অন্ধকারেও বোঝা গেল সেই হাতের মুঠোয় কলমটি ধরা রয়েছে।

"কে, সুন্দর?" অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, সাহেব। দুটো ধরেছি। বেশ বড়সড়, চারজনের হয়ে যাবে।"

"কোথায় পেলে?"

"ওই পাহাড়ের খাঁজে। সিকি মাইল দূরে। কিন্তু সাহেব, আপনারা আস্তে কথা বলুন। আমি দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম।"

"কেন?"

"জঙ্গলে লোক ঢুকেছিল। এখনও আছে কিনা জানি না, আমি এই প্যাকেটটা কুড়িয়ে পেয়েছি পাহাড়ের গায়ে। খেয়ে দেখুন, একেবারে টাটকা। হয়তো কারও পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে।" সুন্দর প্যাকেটটা ওপরে ছুড়ে দিল। অর্জুন কোনওমতে ধরে ফেলল। যত অন্ধকারই হোক আকাশ একটু চোরা আলো পাঠায়। মেজর চাপা গলায় বললেন, "শাবাশ।"

প্যাকেটটা দেখে অর্জুন বলল, "ডানহিল। অর্ধেকের বেশি সিগারেট আছে।"

অমল সোম বললেন, "হুঁ। এদিকের লোকের ডানহিল পাওয়ার কথা নয়।"

ওদিকে সুন্দর বসে গিয়েছে মুরগি নিয়ে। অত দ্রুত মুরগি ছাড়িয়ে কাউকে আগুন জ্বালাতে দেখেনি সে। দুটো লম্বা কাঠির মধ্যে একটা কাঠি আড়াআড়ি পেতে তার তলায় আগুন জ্বালিয়ে দিল সুন্দর। তারপর মুরগি

দুটোকে আড়াআড়ি কাঠির মধ্যে কায়দা করে ঝুলিয়ে দিল। দিয়ে বলল, "বড্ড জোঁক হয়েছে জঙ্গলে। কাল জল হওয়ায় ওদের বাড় বেড়েছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে ওরা তিনজন নিজেদের প্যান্ট-শার্ট-জুতো পরীক্ষা করতে লাগল। না, জোঁক কারও শরীরে হানা দেয়নি। নিবিষ্ট হয়ে মুরগি ঝলসাচ্ছিল সুন্দর। বেশ পাকা হাতের কাজ। মিনিট কুড়ি লাগল। তারপর এক-একটা মুরগি দু'টুকরো করে ওপরে চালান করে দিয়ে বলল, "নুন কম লাগবে। তা আর কী হবে!"

অমল সোম বললেন, "আমার সঙ্গে নুন আছে। যার যেমন ইচ্ছে মাখিয়ে নাও।"

সুন্দর ওপরে উঠে এল। প্রায় পাঁচশো গ্রাম ঝলসানো মুরগির মাংসে কামড় দিয়ে অর্জুনের মনে হল এর চেয়ে ভাল রোস্টেড চিকেন সে কখনও খায়নি।

ঠিক তখনই কয়েক হাত দূরে বীভৎস ডাকটা আচমকা শোনা গেল।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

(ক্রমশ)

পরবাসে নিজ বাসভূমি

ছেড়ে-আসা মাটির গন্ধ। তার আলোবাতাসের ছোঁয়া। পনের দিনে একবার প্রবাসী আনন্দবাজার হাতে নিলেই প্রাণে বেজে উঠবে সেই টান। জ্যোতি বসুর সাম্প্রতিকতম বক্তব্য কিংবা কলকাতার কড়চা। কলেজস্ট্রিটের নতুন বইয়ের খবর কিংবা ইলিশমাছের দর। কলকাতার লেটেস্ট ফ্যাশন, বিনোদন, রান্নাবান্না, শিল্পকলা - সব পাবেন প্রবাসী আনন্দবাজারের পাতায়-পাতায়।

একবছরের গ্রাহকচাঁদা ৫০ আমেরিকান ডলার/৩০ স্টার্লিং পাউণ্ড। দু-বছরের গ্রাহকচাঁদা ৬৫ আমেরিকান ডলার/৪০ স্টার্লিং পাউণ্ড।

সবকিছু নিয়ে নতুনভাবে

প্রবাসী আনন্দবাজার

Clarion 5A71801

For subscription/details contact us at :-

Prabashi Anandabazar
6 Prafulla Sarkar Street, Calcutta 700 001, India
Phone : (033) 27 4880/8000
Telex : 021-5468/69
Fax : (033) 2253240/41

Ananda Bazar Patrika Ltd
Wheatsheaf House 4 Carmelite Street
London EC4Y 0BN, UK
Phone [illegible]
Telex [illegible]
Fax [illegible]

Our agents at :-

U.S.A.
[illegible]

প্রচ্ছদকাহিনী

ব্ল্যাক বক্স রহস্য

বিমান কোনও দুর্ঘটনায় পড়লে তার কারণ জানিয়ে দিতে পারে একমাত্র ব্ল্যাক বক্সই। ব্ল্যাক বক্সের মধ্যে ধরা থাকে নিকটতম বিমানবন্দরের কন্ট্রোলের সঙ্গে বিমানটির পাইলটের সমস্ত কথাবার্তা। লিখেছেন চঞ্চল পাল

বিমানের প্রতিটি যন্ত্রই গুরুত্বপূর্ণ। এর পেছনে থাকে প্রযুক্তিবিদদের সদাসতর্ক দৃষ্টি

LABORATOIRES PARIS GARNIER

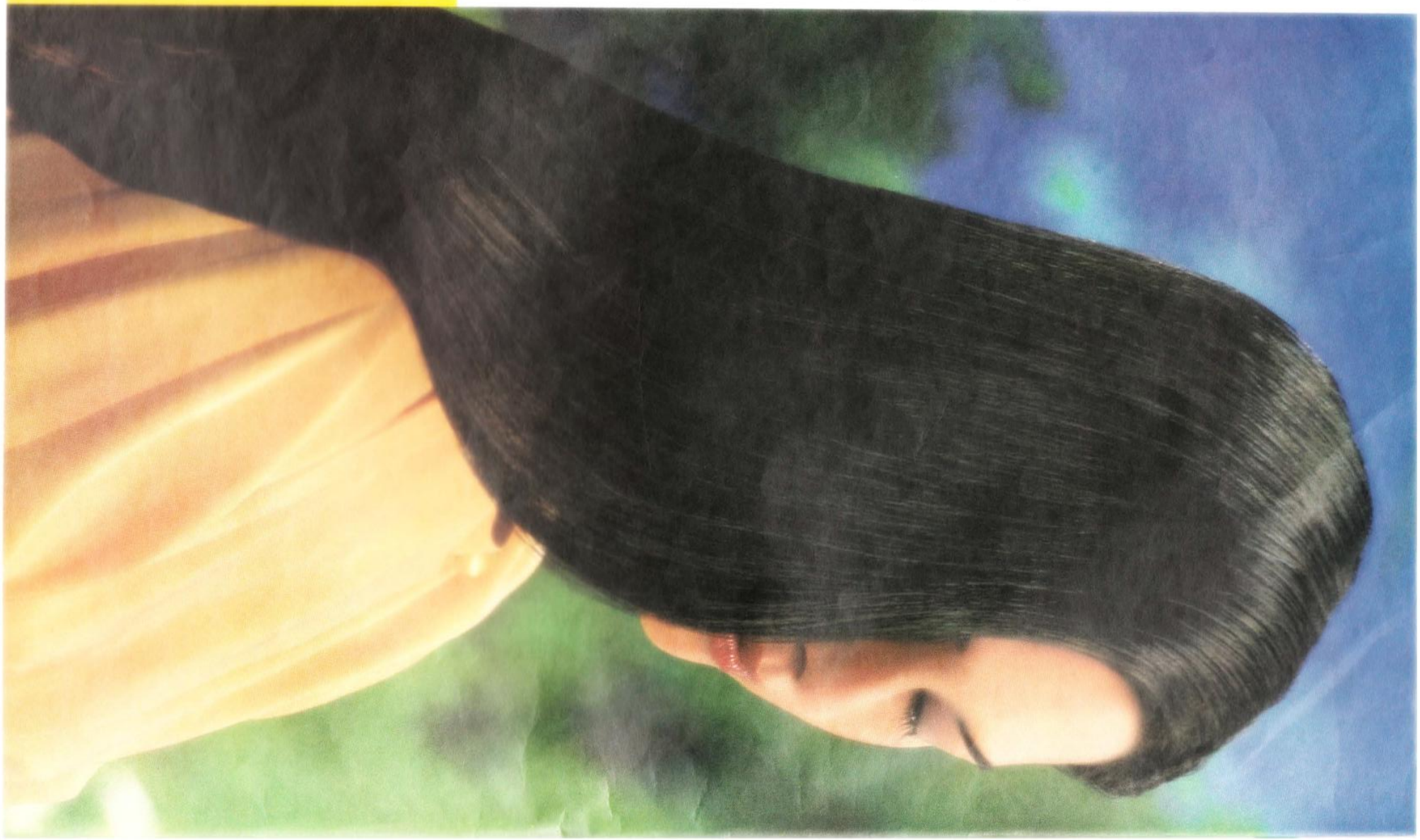

উদ্‌ভাবনা

উল্‌ত্রা দ্যু
নারিশিং হেয়ার অয়েল
প্রকৃতির বুক থেকে সংগ্রহ করা
চুলের পরিপূর্ণ যত্ন নিতে, চুল সজীব রাখতে

নারকেল তেল, বাদাম তেল, ভিটামিন ই আর এফ-এর আদর্শ সংমিশ্রণ

ল্যাবরেটরিস্ গার্নিয়ার প্যারিস-এর সৃষ্টি উল্‌ত্রা দ্যু নারিশিং হেয়ার অয়েলে আছে প্রকৃতির বুক থেকে নিষ্কাসিত উপাদান। যেমন, নারকেল তেল – ভরপুর পুষ্টি যোগাতে; বাদাম তেল – চুল কোমল রাখতে; ভিটামিন ই – চুলের সুরক্ষায়; আর ভিটামিন এফ – প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পূরণ করতে। অন্য আর কোনো হেয়ার অয়েলে এমন অপূর্ব আর ব্যাপক সংমিশ্রণ নেই ! এর প্রত্যেক উপাদান প্রত্যেকটি চুলে একেবারে গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত পুষ্টি যোগায়। মনমাতানো গন্ধেভরা। তেল চিটচিটে হয় না। উল্‌ত্রা দ্যু নারিশিং হেয়ার অয়েল চুলে ছড়ায় স্বচ্ছন্দে, সমান ভাবে। যার ফলে আপনার চুল পায় সেরকম পরিপূর্ণ পুষ্টি যা চুলের পক্ষে একান্ত দরকার।

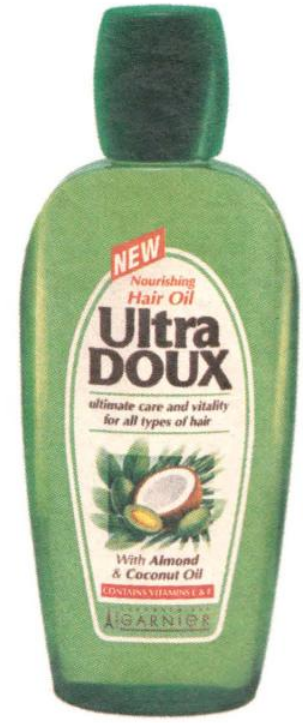

উল্‌ত্রা দ্যু
চুলের সর্বোত্তম যত্ন নেবার উপায়

প্রকৃতির বুক থেকে বিজ্ঞান যেখানে এনেছে উপাদান

হেয়ার অয়েল পুষ্টির জন্য	শ্যাম্পু চুল পরিষ্কার করার জন্য	কণ্ডিশনার চুলে কোমলতা আর চমক আনার জন্য	ইন্‌স্ট্যান্ট ডিট্যাঙ্গলার চটপট জটমুক্ত চুলের জন্য

Ultra DOUX

LABORATOIRES PARIS GARNIER

বিমান দুর্ঘটনার পর হেলিকপ্টারে চলছে জোর তল্লাশি ফোটো : এপি

তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ১৯৮২ সাল। ওয়াশিংটন শহরের ন্যাশনাল বিমানবন্দর থেকে টেক-অফ করল পাম-৯০। এটা বৈমানিকদের দেওয়া আদরের নাম। নথিপত্রে এর পরিচয় এয়ার-ফ্লোরিডা বোয়িং ৭৩৭।

এয়ারপোর্টের কিছু দূরে পটোম্যাক নদী। তার ওপর ওয়াশিংটনের জনবহুল সেতু 'ফোর্টিন্থ স্ট্রিট ব্রিজ'। পাম-৯০ টেক্-অফ করার ১ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড পরেই হুড়মুড় করে নেমে এল এই সেতুর ওপর। ১,০২,৩০০ পাউন্ড ওজনের এই বিমানটির চাপে সঙ্গে-সঙ্গে চিড়েচ্যাপটা হয়ে গেল ছ'টি গাড়ি, দুটি লরি ও ১২ জন পথচারী। সেতুর একপাশে ৪১ ফুট চওড়া কংক্রিটের দেওয়াল ভেদ করে বিমানটি টুকরো-টুকরো হয়ে তলিয়ে গেল পটোম্যাক নদীর জলে। শুধু লেজের দিকের একটু অংশ সেতুর একদিকে বিপজ্জনকভাবে ঝুলতে লাগল। ক্যাপ্টেন ল্যারি হুইটন, ফার্স্ট অফিসার রজার পেটিট ছাড়া আরও তিনজন বিমানকর্মী এবং ৭৪ জন যাত্রী তলিয়ে গেলেন পটোম্যাকের জলে।

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, তবু হঠাৎ এসে পড়ে বিপদ
ফোটো : এপি

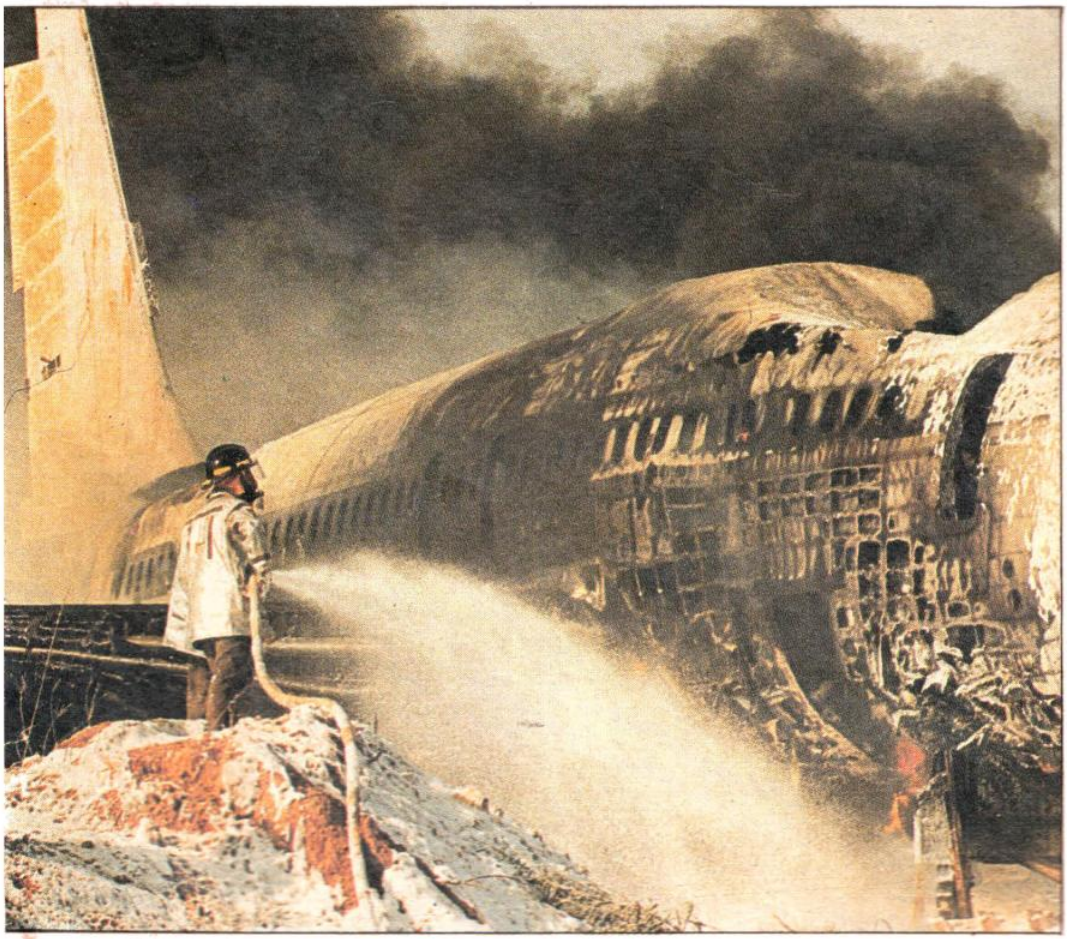

সেদিন ছিল হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা। মাঝে-মাঝেই ঝিরঝির করে তুষারপাত হচ্ছিল। কিন্তু এই আবহাওয়াতেই আরও কয়েকটি বিমান ন্যাশনাল বিমানবন্দর থেকে নির্বিঘ্নে ছেড়ে গেছে, কারও গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। তা হলে এর পেছনে কি অন্য কোনও ষড়যন্ত্র কাজ করছে ?

যতবারই কোনও-না-কোনও বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, ততবারই এই প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে উঁকি দেয়। কিন্তু উত্তর দেবে কে ? প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে কিছুই পাওয়া যায় না। উপায় আছে একটাই। তা হচ্ছে বিমানের 'শবব্যবচ্ছেদ' করা। ভাঙা, পোড়া বিমানের টুকরোগুলি তো বটেই, সবচেয়ে বেশি দরকারি 'ব্ল্যাক বক্স'। তবে হ্যাঁ, একে খুঁজে পেলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না, এর ভেতর থেকে তথ্য বের করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ পাওয়া বিশেষজ্ঞদের দরকার। পাম-৯০-এর ক্ষেত্রেও তাই প্রথম খোঁজ পড়ল ব্ল্যাক বক্সের।

ব্ল্যাক বক্স-এর ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার : এর মধ্যেই ধরা থাকে বিমান দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ

পটোম্যাক নদীতে সেদিন দু' ইঞ্চি পুরু বরফ ভাসছে। বরফের তলাতেও আট ইঞ্চির বেশি দৃষ্টি চলে না। এই পরিস্থিতিতে ৮২ জন অভিজ্ঞ ডুবুরিকে নামানো হল। দিনের পর দিন তাঁরা নদীর তলায় তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে সাতদিনের মাথায় উদ্ধার করা হল দুটি ধাতব বাক্স। তারপর সে-দুটিকে নিয়ে যাওয়া হল 'ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড' (এন-টি-এস-বি)-এর অফিসে। আমেরিকান বিমানের ব্ল্যাক বক্স পরীক্ষা করার অধিকার একমাত্র এদেরই আছে। এই ব্ল্যাকবক্স নিয়ে পাম-৯০ দুর্ঘটনার তদন্ত কীভাবে এগিয়ে চলল, তা জানবার আগে ব্ল্যাকবক্সের সঙ্গে একটু পরিচয় করে নেওয়া যাক।

নামেই এটি ব্ল্যাক বক্স, কিন্তু গায়ে এর কালো রঙের লেশ নেই। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী এর রং কমলা হতেই হবে। তবে বাক্সটির চারপাশে জড়ানো ফিতের মতো উজ্জ্বল হলুদ রঙের সরু দাগ থাকবে। এই হলুদ রংটি এমনই যে, একটু আলো পড়লেই চকচক করে ওঠে। তার ওপর ব্ল্যাক বক্সের গায়ে আটকানো থাকে একটি ছোট 'বেকন ইউনিট,' অনেকটা মেন সুইচের ফিউজের মতো দেখতে। এর ভেতর থেকে উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ (৩৭.৪ কিলোহার্জ) বের হতে থাকে। এটি যদি ২০,০০০ ফুট জলের তলায় ডুবে থাকে, তা হলে এই শব্দতরঙ্গ ৩০ দিন ধরে প্রায় আড়াই মাইল দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। তবে এই শব্দসঙ্কেত ধরার জন্য বিশেষ ধরনের চৌম্বক গ্রাহকযন্ত্র দরকার। পাম-৯০-এর ব্ল্যাক বক্স খুঁজে পেতে সময় লেগেছিল সাত দিন। কিন্তু ১৯৮৫ সালে ৩২৯ জন যাত্রী ও কর্মী সহ এয়ার ইণ্ডিয়ার জাম্বো জেট 'কনিষ্ক' যখন আয়ারল্যান্ডের অদূরে অতলান্তিকের অতল জলে তলিয়ে গিয়েছিল তখন তার ব্ল্যাক বক্স খোঁজা মানুষ-ডুবুরিদের ক্ষমতায় কুলোয়নি। এর জন্য বিশেষ ধরনের রোবট-ডুবুরি নামাতে হয়েছিল মহাসাগরের কয়েকশো ফুট নীচে।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণে, উত্তাপে বা বহু উঁচু থেকে মাটিতে পড়েও যাতে ব্ল্যাক বক্সের ভেতরের যন্ত্রাংশগুলি ঠিকঠাক থাকে তার জন্য বিশেষ ধরনের ইস্পাত ও টাইটানিয়ামের আচ্ছাদন তৈরি করা হয়। এর শক্তি পরীক্ষা করার জন্য ২০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপে ঘন্টার পর ঘন্টা ফেলে রাখা হয় এবং ৫০০ পাউন্ড ওজনের ইস্পাতের চাঙড় ১০ ফুট উঁচু থেকে এর ওপর ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। এত সহ্যক্ষমতা সত্ত্বেও ব্ল্যাক বক্সকে বিমানের লেজের কাছে একটি বিশেষ জায়গায় আটকে রাখা হয়। কারণ, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যে-কোনও ধরনের দুর্ঘটনায়

ককপিট ভয়েস রেকর্ডার

ককপিট ভয়েস রেকর্ডারের (সি-ভি-আর) নাম শুনলেই বোঝা যাবে যে, এর প্রধান কাজ হচ্ছে ককপিটের ভেতরকার কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা। এর অতিসংবেদনশীল গ্রাহকযন্ত্রে খুব ক্ষীণ শব্দও ধরা পড়ে এবং পরে শনাক্ত করা যায়। এতে সাধারণত চারটি চ্যানেল থাকে। ক্যাপ্টেন ও ফার্স্ট অফিসারের সামনে যে মাইক্রোফোন থাকে, সেগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে দুটি চ্যানেল। যদি বিমানে ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের জায়গা থাকে তা হলে একটি চ্যানেল থাকবে তাঁর মাইক্রোফোনে, তা না হলে চ্যানেলটি যুক্ত থাকে ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টের মাইক্রোফোনে, যা দিয়ে তিনি যাত্রীদের কেবিনে ঘোষণা করেন। কথাবার্তা চালানোর জন্য এই তিনটি মাইক্রোফোন যখন অন করা হয়, তখনই ককপিট ভয়েস রেকর্ডারে টেপরেকর্ডিং চলতে থাকে। মাইক্রোফোন বন্ধ করলে রেকর্ডিংও বন্ধ হয়ে যায়। এই রেকর্ডার একনাগাড়ে ৩০ মিনিট কথাবার্তা ধরে রাখতে পারে। ৩০ মিনিট পরে পুরনো রেকর্ডিং মুছে আবার নতুন করে রেকর্ডিং হতে থাকে। অর্থাৎ দুর্ঘটনার ৩০ মিনিট আগে পর্যন্ত ককপিটের কণ্ঠস্বর অক্ষত থাকে।

কিন্তু চতুর্থ চ্যানেলটি থাকে পাইলটের মাথার ওপর একটি সবসময় খুলে রাখা মাইক্রোফোনের সঙ্গে। এই মাইক্রোফোনে কণ্ঠস্বর পরিষ্কারভাবে ধরা না পড়লেও ককপিটের অন্যান্য শব্দ, যেমন ককপিটের ভেতরের ২৮ ভোল্টের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ঘর্ঘর এঞ্জিন ঠাণ্ডা রাখার কুলিং ফ্যান-এর আওয়াজ। অল্টিমিটারের ভেতরের 'ভাইব্রেটর'-এর কম্পন, এঞ্জিনের গোঙানি ইত্যাদি ঠিকই রেকর্ড হয়ে যায়। এই টেপরেকর্ডারের টেপ বা ফিতে এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি, যাতে খুব সূক্ষ্ম শব্দও রেকর্ড করা যায়, তবে এক বছরের বেশি ফেলে রেখে দিলে এর থেকে পাঠোদ্ধার করা কঠিন।

বৈমানিকের আসনে ফোটো : এপি

নামেই এটি ব্ল্যাক বক্স, কিন্তু গায়ে এর কালো রঙের লেশ নেই। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী এর রং কমলা হতেই হবে। তবে বাক্সটির চারপাশে জড়ানো ফিতের মতো উজ্জ্বল হলুদ রঙের সরু দাগ থাকবে। এই হলুদ রংটি এমনই যে, একটু আলো পড়লেই চকচক করে ওঠে। তার ওপর ব্ল্যাক বক্সের গায়ে আটকানো থাকে ছোট একটি 'বেকন ইউনিট', অনেকটা মেন সুইচের ফিউজের মতো দেখতে। এর ভেতর থেকে উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ (৩৭.৪ কিলোহার্জ) বের হতে থাকে।

বিমানের এই অংশটি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা ছাড়া ব্ল্যাক বক্সের আয়তন ও ওজন এত কম যে, একটা ছোট হাত-ব্যাগের মধ্যে অনায়াসে বয়ে নিয়ে যাওয়া চলে। লম্বায় ১২.৫ ইঞ্চি, চওড়ায় ৭.৫ ইঞ্চি ও উচ্চতায় মাত্র ছ' ইঞ্চি। ওজন খুব বেশি হলে ৪০ পাউন্ড। তবে ব্ল্যাক বক্স একটিমাত্র যন্ত্রের বাক্স নাও হতে পারে। তিনটি বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বা 'সিস্টেম'কে একসঙ্গে চলতি কথায় বলা হয় ব্ল্যাক বক্স। এই তিনটি যন্ত্রাংশের পারিভাষিক নাম—১) ককপিট ভয়েস রেকর্ডার, ২) ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার এবং ৩) ডিজিটাল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার।

এবার সেই তদন্তের কথায় ফিরে আসা যাক। অপরাধ যেখানে ঘটে তার চারপাশে তো কত কিছু পড়ে থাকে। কিন্তু সে-সবের ভেতর থেকে কোনগুলি অপরাধী ধরার সূত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হবে, তা একমাত্র অভিজ্ঞ গোয়েন্দারাই বুঝতে পারেন। তেমনই ব্ল্যাক বক্স নিজে গোয়েন্দা নয়, সে শুধু তথ্য সরবরাহ করে। কিন্তু এই লক্ষ-লক্ষ তথ্যের ভেতর থেকে কোনগুলি দুর্ঘটনার সূত্র হতে পারে তা বুঝতে পারবেন শুধুমাত্র বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ বিমান-প্রযুক্তিবিদরাই। এই গোয়েন্দাগিরি লিখে বোঝানো সম্ভব নয়, তবে পাম-৯০ তদন্তের কিছু-কিছু ঘটনা বললে আঁচ করা যেতে পারে যে, এই কাজ যেমন জটিল তেমনই চমকপ্রদ।

এন-টি-এস-বি'র ফয়েল রেকর্ডার বিশেষজ্ঞ বিলি হুপার ১৯৫৭ সাল থেকে এই সংস্থায় ব্ল্যাক বক্স তদন্তের কাজে লেগে আছেন। তিনি আর তাঁর সুযোগ্য শিষ্য পল টারনার ভার পেলেন পাম-৯০ তদন্তের। দরকার পড়লে সাহায্য করার জন্য রইলেন ডেনিস গ্রোসি। ইনি ডিজিটাল

ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দরে ভেঙে পড়েছে

ফ্লাইট রেকর্ডার ও কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। কিন্তু পাম-৯০ বিমানে ডি-এফ-ডি-আর ছিল না বলে ডেনিস গ্রোসিকে এ ব্যাপারে খুব একটা সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয়নি।

যেহেতু ফয়েল রেকর্ডারের প্রতি বিলি হুপারের দুর্বলতা বেশি, সেহেতু সেটিতেই আগে হাত দেওয়া হল। এর তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেল যে, পাম-৯০ মাত্র ৩৮৪ ফুট উঁচুতে উঠতে পেরেছিল। তা ছাড়া সর্বোচ্চ গতিবেগ দাঁড়িয়েছিল ১৪০ থেকে ১৪৫ নট। দুর্ঘটনার কয়েক সেকেন্ড আগে বিমানটি উঁচুতে ওঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল, কিন্তু সেই সময় বিমানের গতিবেগ বেড়ে যাওয়া তো দূরের কথা, খুব দ্রুতহারে কমে আসছিল। তারপরই যা ঘটবার ঘটে গেল।

এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু তথ্য ফয়েল রেকর্ডার থেকে পাওয়া গেল না। শুধুমাত্র এটুকু আন্দাজ করা যেতে পারে যে, বিমানে কোনও বোমা ফাটেনি। তা যদি হত তা হলে বিমানের গতিবেগে ওইরকম অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ত না। বরং বিমানটি স্বচ্ছন্দভাবে উড়তে-উড়তে হঠাৎ বিস্ফোরিত হত। কিন্তু কোথায় যে আসল গোলমাল, তা পরিষ্কার করে বলতে পারল না ফয়েল রেকর্ডার।

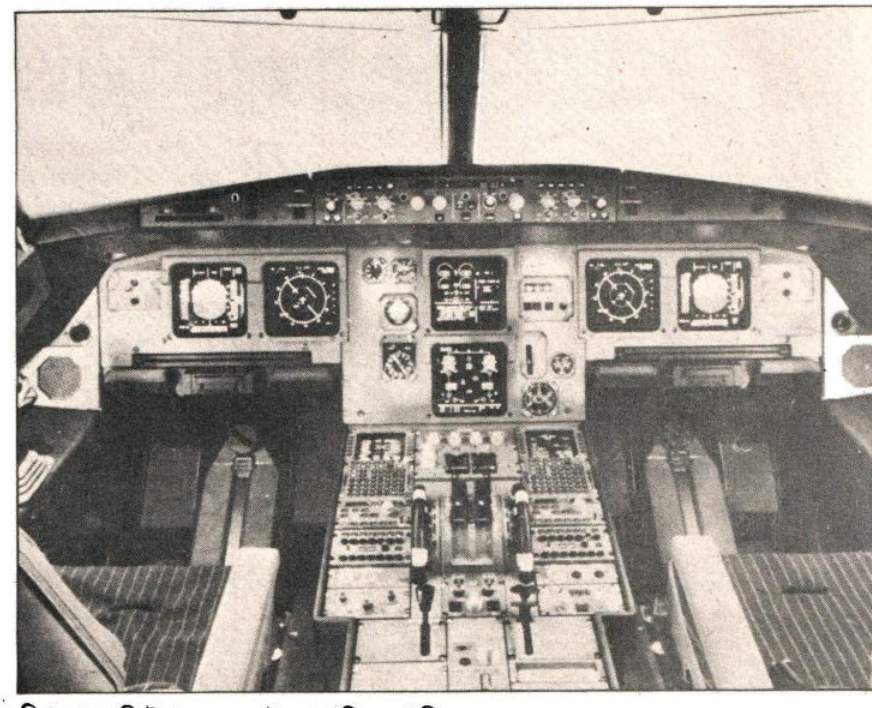

বিমানের ককপিটে থাকে এরকমই নানা জটিল যন্ত্রপাতি

উজবেক বিমান

অগত্যা ককপিট ভয়েস রেকর্ডারের দিকে নজর বেশি করে দিতে হল। আপাতদৃষ্টিতে ককপিটের কথাবার্তা থেকে শুধু এটুকু বোঝা গেল যে, হুইটন ও পেটিট কিছু যান্ত্রিক গোলমাল লক্ষ করেছিলেন। অথচ সেই গোলমালটা ঠিক কী জন্য হচ্ছে, তা কিছুতেই ধরতে পারছিলেন না।

রানওয়েতে যখন বিমানটি দাঁড়িয়ে ছিল তখন ওঁরা দু'জনেই ককপিটে উঠে অপেক্ষা করছিলেন। হ্যাঙার থেকে বিমানটি বের করে আনার পর ওঁরা সেটিকে একটি নিউ ইয়র্কগামী ডি-সি-৯ বিমানের ঠিক পেছনে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন ; কারণ ডিসি-৯ ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাম-৯০ ছাড়ার কথা। এই সময়ে তাঁরা বিভিন্ন সুইচ নেড়েচেড়ে দেখছিলেন, সব ঠিক আছে কিনা। তখন ডি-সি-৯-এর 'এগ্‌জস্ট' থেকে গরম বাতাস সজোরে এসে পাম-৯০ এর 'এয়ার-ইনলেট'-এর (যার মধ্য দিয়ে বাতাস ঢোকানো হয়) ওপর এসে পড়ছিল। এই সময় পেটিট একবার অবাক হয়ে বলেছিলেন, "দেখুন,বাঁ দিকের আর

বিমান ধ্বংসের পর : চলছে
মৃতদেহ শনাক্তকরণের পালা
ফোটো : এপি/পিটিআই

প্রচণ্ড বিস্ফোরণে, উত্তাপে বা বহু উঁচু থেকে মাটিতে পড়েও যাতে ব্ল্যাক বক্সের ভেতরের যন্ত্রাংশগুলি ঠিকঠাক থাকে, তার জন্য বিশেষ ধরনের ইস্পাত ও টাইটানিয়ামের আচ্ছাদন তৈরি করা হয়। এর শক্তি পরীক্ষার জন্য ২,০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেলে রাখা হয় এবং ৫০০ পাউন্ড ওজনের ইস্পাতের চাঙড় ১০ ফুট উঁচু থেকে এর ওপর ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। এত সহ্যক্ষমতা সত্ত্বেও ব্ল্যাক বক্সকে বিমানের লেজের কাছে একটি বিশেষ জায়গায় আটকে রাখা হয়। কারণ, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যে-কোনও ধরনের দুর্ঘটনায় বিমানের এই অংশটি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার

ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডারে সাধারণত বিমানের পাঁচটি তথ্য রেকর্ড করা হয়। ১) কত ওপর দিয়ে উড়ছে ; ২) কত জোরে এগোচ্ছে ; ৩) কীভাবে দিক বদল করছে ; ৪) ত্বরণ বা গতিবেগ বৃদ্ধির হার কীরকম ; এবং ৫) বিভিন্ন ঘটনা ঘটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কতখানি। এই যন্ত্রে তথ্য রেকর্ড করা হয় পাতলা ধাতব পাতের ওপর, তাই একে ছোট করে ফয়েল রেকর্ডারও বলা হয়। একটি সরু ধাতব শলাকা ধাতব পাতটির ওপর অনবরত দাগ কেটে চলে। এই পাঁচ ধরনের ঘটনাবলী পরিবর্তিত হলে দাগের ধরনটাও বদলে যায়। এখন সাধারণত পাঁচরকমের বিমানে ফয়েল রেকর্ডার রাখা হয়। সেগুলি হল এফ-২৭, ফকার, অ্যাভ্রো, বোয়িং ৭০৭ ও ৭৩৭। তবে ব্ল্যাক বক্স বিশেষজ্ঞরা আজকাল এই যন্ত্রাংশটিকে অপরিহার্য মনে করেন না। কারণ ডিজিটাল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার থাকলেই নাকি যথেষ্ট।

ডান দিকের এঞ্জিনের মিটারে তফাত হচ্ছে কেন ?"

"হ্যাঁ তাই তো !" হুইটন জবাব দিয়েছিলেন।

"কে জানে কী ব্যাপার ! হয়তো গরম হাওয়া ডান দিকের এঞ্জিনটায় ধাক্কা দিচ্ছে বলে এরকম হচ্ছে।"

ঠিক এই সময়েই গ্রাউন্ড কন্ট্রোল থেকে জরুরি তলব এল। তার উত্তর দিতেই তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এঞ্জিনের দুটো মিটারের এই অস্বাভাবিকতাকে তাঁরা তখনই বিশেষ গুরুত্ব দেননি। টেক-অফ করার ঠিক পরেও যখন দুটো 'রিডিং'-এ তফাত রয়ে গেল, তখন তাঁরা গ্রাউন্ড কন্ট্রোলকে জানিয়েছিলেন প্রতিকারের আশায়।

ততক্ষণে ঘাত-নির্দেশক মিটারেও কিছু একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল। বিমানটি ওপরে ওঠার জন্য তখন চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় শক্তি বা ঘাতের সাহায্য পাচ্ছে না। তখন....

পেটিট : আরে, এখানে আবার কী হল ! মিটার তো উঠছে না !

হুইটন : হ্যাঁ, মোটে তো ৮০।

পেটিট : এইটুকুতে কী হবে ?

হুইটন : না, না, এই তো ১২০ উঠছে।

পেটিট : এতে বোধ হয় চলবে না।

হুইটন : সামনে চালাও। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। আস্তে-আস্তে ওপরদিকে ওঠাও। ৫০০ দরকার।

পেটিট : ল্যারি, ল্যারি। আমরা নেমে যাচ্ছি যে !

হুইটন : সে কী ! কী হল ?

পাম-৯০ ভেঙে পড়ার আগে এটাই শেষ কথা।

বিলি হুপার চেষ্টা করছিলেন এইসব কথাবার্তা থেকে কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না। তাই অন্যান্য শব্দ তিনি খেয়াল করেননি। পল টারনারই প্রথম সন্দেহ করলেন এ-ব্যাপারে। ফোর্থ চ্যানেলে যে শব্দগুলো রেকর্ড হয়েছিল তাতে এঞ্জিনের গোঙানিটা তাঁর কানে খটকা লাগাল। তা হলে এঞ্জিনটা কি ঠিকমত চলছিল না ? ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডারে যে পাঁচটি প্রধান তথ্য রেকর্ড করা হয় তাতে এঞ্জিনের গতিবিধি ধরার উপায় থাকে না। ফলে পাম-৯০ বিমানের 'টুইন প্র্যাট' ও 'হুইট্‌নি জেটি ৮ডি'

ডালাস-এ ভেঙে পড়েছে ডেলটা

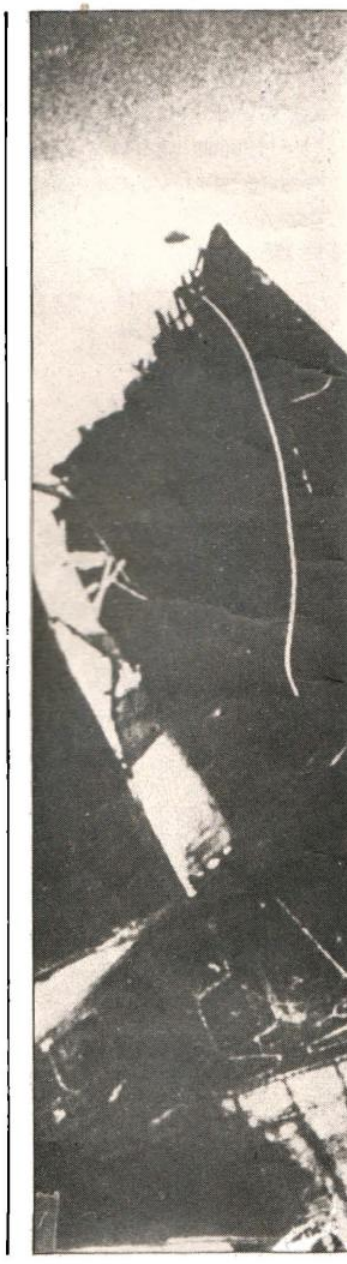

টারবো-জেট এঞ্জিন দুটো পরীক্ষার জন্য পাঠানো হল পাম-৯০ নির্মাতাদের কাছে। কিন্তু সব সন্দেহ মিথ্যে প্রমাণ করে রিপোর্ট এল যে, এঞ্জিন দুটি সম্পূর্ণ ঠিকঠাক ছিল।

তা হলে শব্দটা অস্বাভাবিক লাগছে কেন ? শব্দতরঙ্গের আরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষক বস্ত্র (ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম অ্যানালাইজার) নিয়ে বসলেন দু'জনে। এঞ্জিন যত জোরে ঘোরে আর যত ঘাত উৎপন্ন করে তার অনুপাতে এঞ্জিনের গোঙানির কম্পাঙ্ক বাড়ে-কমে। পাম-৯০-তে এই গোঙানির কম্পাঙ্ক উঠেছিল সর্বোচ্চ ৩২৫০ হার্জ। কিন্তু সহজভাবে টেক-অফ করতে এই কম্পাঙ্ক হওয়া দরকার অন্তত ৩৮৫০ হার্জ। দুর্ঘটনার দিন বিমানের ডানা ও ফিউজল্যাগে তুষারপাতের দরুন ১৪,০০০ পাউন্ড ঘাত উৎপন্ন হওয়া দরকার। কিন্তু পাম-৯০ মাত্র ১০,৭৫০ পাউন্ড ঘাত তুলেই টেক-অফ করেছিল। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় শক্তি উৎপাদন হয়েছিল ১৫ শতাংশ কম।

কিন্তু মিটারের রিডিং দেখে দু'জনেই ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন। কারণ একটি এয়ার ইনলেট-এর মুখ বরফ জমে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই প্রয়োজনীয় বাতাস বিমানের নীচে ধাক্কা দিয়ে ওপরে তুলতে পারছিল না। ফলে পাওয়ার মিটার ও ঘাত-নির্দেশক মিটারের রিডিং মিলছিল না। সাধারণ তুষারপাতে এই ইনলেট বন্ধ হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া 'অ্যান্টি আইস অপারেশন'-এর সাহায্যে ভেতর থেকে গরম বাতাস চালিয়ে ইনলেটের মুখ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা আছে। বিমানটি হ্যাঙারে থাকার সময়

এয়ারলাইন্সের বিমান ফোটো : ডিপিএ ফিচারস্

দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা
ফোটো : জিতেন্দর গুপ্তা

> ব্ল্যাক বক্স যদি ২০,০০০ ফুট জলের তলায় ডুবে থাকে, তা হলে এর শব্দতরঙ্গ ৩০ দিন ধরে প্রায় আড়াই মাইল দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। তবে এই শব্দসঙ্কেত ধরার জন্য বিশেষ ধরনের চৌম্বক গ্রাহকযন্ত্র দরকার।

ডিজিটাল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার

ডিজিটাল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার (ডি-এফ-ডি-আর) এত দামি যে, একটিরই দাম পড়ে দুই থেকে চার লক্ষ টাকা। কারণ এটি কম্পিউটার চালিত। এর যেসব সূক্ষ্ম সংবেদনশীল গ্রাহকযন্ত্র বিমানের নানা জায়গায় ছড়ানো থাকে সেগুলি থেকে অসংখ্য তথ্য একজোট করে একটি 'ফ্লাইট ডেটা অ্যাকুইজিশন ইউনিট' বা 'এফ-ডি-এ-ইউ'। সংক্ষেপে একে উচ্চারণ করা হয় 'ফ্যাহ্‌ড়ু' বলে। এরই দাম দেড় লক্ষ টাকার কম নয়। এর স্মৃতিতে ধরে রাখা যায় অসংখ্য তথ্য, যেমন বিভিন্ন বিমানবন্দর থেকে বিমানের আপেক্ষিক অবস্থান, এঞ্জিনগুলির অবস্থা এঞ্জিনে কত পাওয়ার উঠছে, নামছে, বাতাসের চাপ বিমানের চারপাশে কীভাবে বাড়ছে-কমছে, জ্বালানির চাপ কত হওয়া উচিত ইত্যাদি। তথ্যের সংখ্যা নির্ভর করে বিমানের মডেল ও তার মালিকের ওপর। যেমন, এয়ার বাসের ক্ষেত্রে এই তথ্যের সংখ্যা ৮২টি, কিন্তু জাম্বো বিমানের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায়। সম্প্রতি খরচ কমানোর জন্য মাত্র ১৭টি একান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের ডি-এফ-ডি-আর লাগানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে আমেরিকার অন্তর্দেশীয় কয়েকটি ছোট পরিবহণ বিমানে।

ডিজিটাল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার কম্পিউটারের ভাষায় দ্বিনিধানি সংখ্যায় (বাইনারি নম্বর) তথ্য জমা করে বলে এই যন্ত্রাংশটির নামের প্রথম শব্দটি হচ্ছে 'ডিজিটাল'। এর পর পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে এই সাঙ্কেতিক ভাষার পাঠোদ্ধারের জন্য আর-এক প্রস্থ কম্পিউটারের দরকার। এর নাম ভ্যাক্স-৭৫০। ডি-এফ-ডি-আর প্রতিটি তথ্যের জন্য কয়েক হাজার সঙ্কেত জড়ো করে। সবক'টি তথ্য মিলে সঙ্কেতের সর্বোচ্চ সংখ্যা দাঁড়াতে পারে ৬ কোটি ৯০ লক্ষ। সাধারণ ফুলস্কেপ পাতায় এই সঙ্কেতগুলি টাইপ করলে অন্তত ৭০০০ পাতা লাগবে। ১০ বছর সময় নিলেও মানুষের মস্তিষ্ক কি এত সঙ্কেতের পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে পারত ?

সে-ব্যবস্থা করাও হয়েছিল। কিন্তু কাল হল ডি-সি-৯- এর পেছনে দাঁড় করিয়ে রাখা। কারণ সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে গরম বাতাস ইনলেটের চারপাশের তুষারের গুঁড়ো গলিয়ে ইনলেটের মুখে জমা করেছিল। তারপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সেই বরফগলা জল আবার জমে বরফ হয়ে ইনলেট বন্ধ করে দেয়। তখনই যদি সন্দেহটা পাইলটদের মাথায় আসত, তা হলে আবার 'অ্যান্টি আইস অপারেশন' করা যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, দু'জনেই এ-ব্যাপারে পারদর্শী ছিলেন না।

অন্য বিমানের এগ্‌জস্টের গরম হাওয়া পেছনের বিমানের ইনলেটকে বরফে ঢেকে দিতে পারে কি না তা নিঃসংশয়ে জানার জন্য তুলনামূলক পরীক্ষা (সিমুলেশন) করতে হয়েছিল। অর্থাৎ সেইরকম তুষারভেজা আবহাওয়ায় একটি পাম-৯০-কে একটি ডি-সি-৯-এর পেছনে দাঁড় করিয়ে এগ্‌জস্ট চালানো হল। এর ফলে মিটারের রিডিংয়ে তারতম্য এবং উৎপন্ন ঘাতের শতকরা হিসেব যা বের হল তা দুর্ঘটনায় পড়া পাম-৯০-এর ব্ল্যাক বক্স থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এইসব তথ্য থেকে পাম-৯০ দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে বলা যায়, প্রধানত বৈমানিকদের অদূরদর্শিতা এবং কিছুটা কর্তব্যে অবহেলা।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ব্ল্যাক বক্স তদন্তের গতিবিধি কখন যে কোন দিকে মোড় নেবে, তা আগেভাগে কল্পনা করাও যায় না। এত জটিলতা আছে বলেই সব দুর্ঘটনার কারণ নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবু ব্ল্যাক বক্স আছে বলেই তার ওপর ভর দিয়ে বহুদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। তা না হলে তো শুধুই অনুমানের ওপর নির্ভর করে প্রতিপদে হোঁচট খেতে হত !

কবে থেকে ব্ল্যাক বক্স

ব্ল্যাক বক্সের উপযোগিতা প্রথম উপলব্ধি করে আমেরিকার সিভিল এরোনটিক্স বোর্ড। এই সংস্থা সমস্ত বাণিজ্যিক বিমানগুলিতে ব্ল্যাক বক্স লাগানোর জন্য প্রথম বাধ্যতামূলক আইন তৈরি করে ১৯৪০ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্ল্যাক বক্স নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রায় বন্ধই ছিল। তারপর পৃথিবীর কয়েকটি বিমান পরিবহণ কোম্পানি মিলিতভাবে তৈরি করে 'এরোনটিক্যাল রেডিও ইনকরপোরেটেড'। এরা ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি একটি তালিকা তৈরি করে, যার নাম আরিঙ্ক -৫৪২। এই তালিকাটিতে নির্দেশ দেওয়া ছিল কোন ধরনের বিমানে কী-কী প্রযুক্তিগত কলাকৌশল থাকা দরকার। এর মধ্যে ব্ল্যাক বক্স ছিল অবশ্যপ্রয়োজনীয়। আধুনিক ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার প্রথম তৈরি করে লকহিড নামের বিমান নির্মাণকারী সংস্থা, ১৯৫৮ সালে। এখন শতকরা ৪০টি এফ-ডি-আর তৈরি করে এরাই। অন্য নির্মাতাদের মধ্যে আছে ফেয়ারচাইল্ড ওয়েস্টন এবং সান্ডস্ট্র্যান্ড কর্পোরেশন। শেষের দুটি সংস্থা ককপিট ভয়েস রেকর্ডার তৈরিতেও দক্ষ। ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে যখন বিশালবপু যাত্রিবাহী বিমান (যেমন বোয়িং ৭৪৭, ডি-সি-১০, এল-১০১১ ইত্যাদি) চলাচল বাড়তে থাকে, তখন থেকেই তদন্তের খাতিরে ডিজিটাল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার লাগানো জরুরি হয়ে পড়ে।

প্রচ্ছদকাহিনী

হঠাৎ আতঙ্ক আকাশপথে

মাত্র দু' মিনিট দেরি করে ফেলেছিলেন যশবন্ত বসুতা। আয়ারল্যান্ড-এ ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নিউ ইয়র্ক-এ ফিরছিলেন তিনি। ভারতীয় হলেও নিউ ইয়র্কেই তাঁর বসবাস। সেখানে ভলভো কোম্পানির বড় চাকুরে তিনি। বিয়েবাড়ির ব্যাপার। অনেকদিন পর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে তাই খানিকটা দেরিই

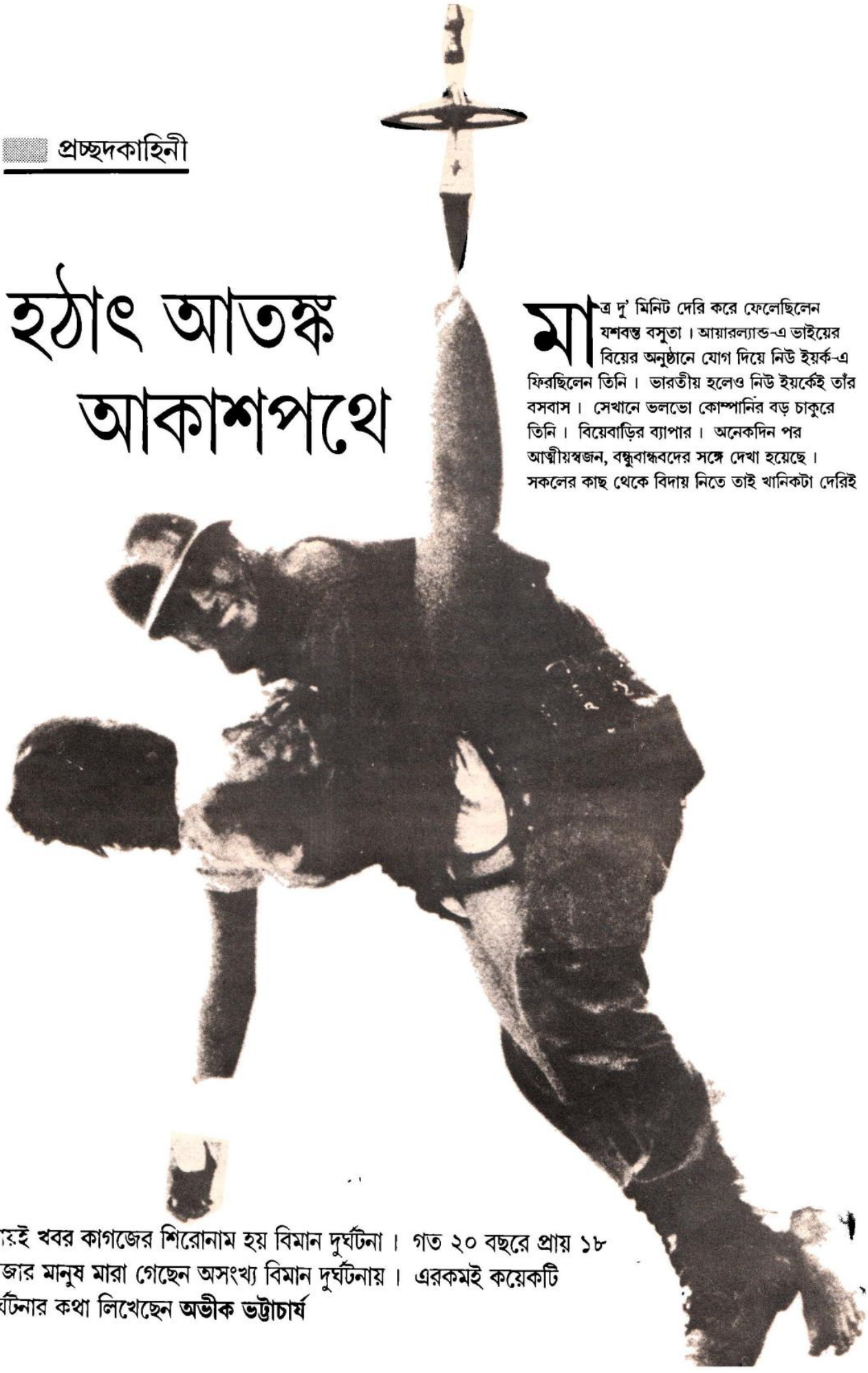

প্রায়ই খবর কাগজের শিরোনাম হয় বিমান দুর্ঘটনা। গত ২০ বছরে প্রায় ১৮ হাজার মানুষ মারা গেছেন অসংখ্য বিমান দুর্ঘটনায়। এরকমই কয়েকটি দুর্ঘটনার কথা লিখেছেন **অভীক ভট্টাচার্য**

পাইলটই যখন রক্ষাকর্তা

অনেক ক্ষেত্রে বিমানের এঞ্জিনের গোলযোগের জন্য জরুরি অবতরণ ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। রীতিমত ঝুঁকি নিয়েই পাইলট তখন নামিয়ে আনতে বাধ্য হন বিমানটিকে। ১৯৯৩ সালের ১৯ এপ্রিল উত্তর-জাপানের হানামাকি বিমানবন্দরে ঘটেছিল এরকমই একটি ঘটনা। প্রাণসংশয় হয়ে যেতে বসেছিল জাপান এয়ার সিস্টেম-এর একটি ডি-সি-৯ বিমানের ৭৭ জন যাত্রীর। ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে পাইলট যখন বিমানটিকে নামানোর চেষ্টা করছিলেন তখন হঠাৎই বিমানের ডান দিকে আগুন ধরে যায়। ধোঁয়া দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন যাত্রীরা। ইতিমধ্যে হাওয়ার ধাক্কায় দুলতে-দুলতে বিমানটি রানওয়েতে নেমে আসে। যে-কোনও মুহূর্তে গোটা বিমানে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারত। কিন্তু পাইলট যথেষ্ট উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে প্রায় অক্ষত অবস্থাতেই বিমানটিকে টাচ-ডাউন করান। 'এমার্জেন্সি এগ্‌জিট' দিয়ে তিনি বের করে দেন যাত্রীদের। এয়ার-পকেটে বেশ কয়েকবার ঝাঁকুনি খেয়েছিল বিমানটি, অন্তত ২০ জন যাত্রী অল্পবিস্তর আহতও হয়েছিলেন। কিন্তু মারা যাননি কেউই। যাত্রীরা সকলে নিরাপদে বেরিয়ে আসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে জ্বালানি-ট্যাঙ্কে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে বিস্ফোরণ। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা যাত্রীদের চোখের সামনেই চুরমার হয়ে যায় প্লেনটি।

চলছে বৈমানিকদের ক্লাস

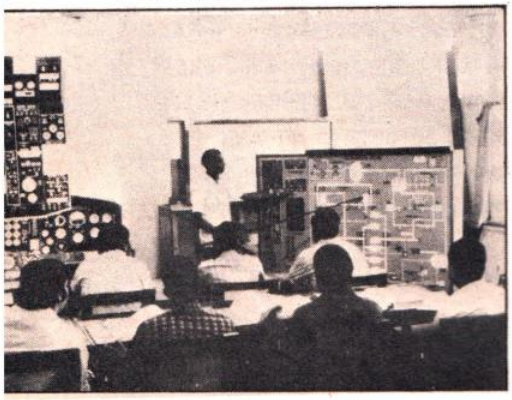

পাম-৯০-এর ব্ল্যাক বক্স খুঁজে পেতে সময় লেগেছিল সাত দিন। কিন্তু ১৯৮৫ সালে ৩২৯ জন যাত্রী ও কর্মী সহ এয়ার ইন্ডিয়ার জাম্বো জেট 'কনিষ্ক' যখন আয়ারল্যান্ডের অদূরে অতলান্তিকের অতল জলে তলিয়ে গিয়েছিল তখন তার ব্ল্যাক বক্স খোঁজা মানুষ-ডুবুরিদের ক্ষমতায় কুলোয়নি। এর জন্য বিশেষ ধরনের রোবট-ডুবুরি নামাতে হয়েছিল মহাসাগরের কয়েকশো ফুট নীচে।

হয়ে গিয়েছিল সেদিন। তারপর যানজট ইত্যাদির ঝামেলা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে-ছুটতে যখন হিথরো এয়ারপোর্টের লাউঞ্জ-এ এসে পৌঁছলেন যশবন্ত বসুতা, ততক্ষণে সমস্ত যাত্রীর 'চেক ইন' হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে 'প্যান অ্যাম ফ্লাইট ওয়ান-ও-থ্রি' জাম্বোর হোল্ডে পৌঁছে গেছে তাঁর জিনিসপত্রও। এয়ারপোর্টের অফিসারদের বহু অনুনয়-বিনয়, বহু কাকুতি-মিনতি করেও কোনও ফল হল না। "সমস্ত যাত্রীর নাম ঘোষণা হয়ে গেছে, এর পর কোনওভাবেই তা পরিবর্তন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়"— স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কর্তব্যরত এক অফিসার। "দেরি দেরিই, আমরা দুঃখিত"— এই ছিল বসুতার প্রতি তাঁর শেষ উক্তি। হতাশ বসুতার চোখের সামনে দিয়ে রানওয়ে পেরিয়ে আকাশে উঠল প্যান অ্যাম ফ্লাইট ওয়ান-ও-থ্রি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, বোয়িং ৭৪৭-এর ডিউটি ম্যানেজার ক্রিস্টোফার প্রাইস (ইনিই সেই ভদ্রলোক, যিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বিমানে উঠতে দেওয়ার জন্য বসুতার সনির্বন্ধ অনুরোধ) যে কীভাবে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন বসুতাকে, তা তখনও বুঝতে পারেননি তিনি। এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ২৬৯ জন যাত্রী নিয়ে স্কটল্যান্ড-এর লকারবি অঞ্চলে ভেঙে পড়ল প্যান অ্যাম ফ্লাইট ওয়ান-ও-থ্রি বোয়িং ৭৪৭। ফ্লাইট মিস করে হতভম্ব বসুতা তখনও বুঝে উঠতে পারেননি কোথায় যাবেন, কী করবেন। লাউঞ্জে বসে থাকতে-থাকতেই তাঁর কানে এল মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার খবর। খবরটা পেয়ে কয়েক মুহূর্তের ঘোর কাটিয়ে তিনি কেবল বলতে পেরেছিলেন, "হে ঈশ্বর"। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিউ ইয়র্কে তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলের কাছে পৌঁছে যায় দুর্ঘটনার খবর। তার কিছুক্ষণ পরেই হিথরো থেকে ফোন করে তিনি তাঁদের যখন জানাচ্ছেন যে, দু' মিনিট

মাঝ-আকাশে এভাবেই ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

দেরি করে ফেলায় ওই প্লেনে তিনি উঠতে পারেননি, তখন তাঁর স্ত্রী প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাননি, তাঁর স্বামী বেঁচে আছেন।

একেই বলে কপাল। আর মাত্র দু' মিনিট আগে যদি তিনি এসে পৌঁছতেন এয়ারপোর্টে তবে ওই ২৬৯ জন নিহত যাত্রীর নামের তালিকায় থাকত তাঁর নাম।

প্রায় এরকমই কপাল ছ' বছরের ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে লিজা ডেভিস-এরও। এতটা নাটকীয় না হলেও প্রায় এরকমই অবিশ্বাস্য ওর বেঁচে যাওয়ার কাহিনী।

১৯৮৮ সালের ২১ ডিসেম্বরের ওই অভিশপ্ত ফ্লাইটে ওরও টিকিট কাটা ছিল। কভেনট্রি-তে ওর ঠাকুমা-র কাছে বেড়াতে এসেছিল লিজা, কথা ছিল বড়দিন কাটাবে মা-র কাছে, নিউ ইয়র্কে। ঠাকুমা মেলবা জনসন সেই কথামতোই ২১ ডিসেম্বরের ফ্লাইটে কেটে রেখেছিলেন ওর টিকিট। কিন্তু কী যে হল ছোট্ট লিজার, শেষ মুহূর্তে বায়না জুড়ে বসল, আরও কয়েকদিন তাকে থাকতে দিতে হবে। নাতনির বায়নায় ঠাকুমা মেলবা নিউ ইয়র্কে লিজার মা রোজালি ডেভিসকে ফোন করে জানালেন, লিজার টিকিট ক্যানসেল করা হয়েছে। বড়দিনে মেয়েকে কাছে পাবেন না, এটা জেনে নিশ্চয়ই খুব খুশি হতে পারেননি রোজালি। কিন্তু দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর নিজেকে তিনি ভেবেছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মা। রোজালির কথায় "আমি জানি না, ঈশ্বর কেবল আমাকেই এত করুণা কেন করলেন!"

অবশ্য উলটো রকমের কপালও হয়! ভিসা-র সমস্যা যদি মিটে যেত, তা হলে মৃদুলা শাস্ত্রীকে ওই নিউ ইয়র্কগামী প্যান অ্যাম বিমানটিতে থাকতে হত না। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব মেডিসিন' করে মাস তিনেক আগে মৃদুলা এসেছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেন্ট জন্‌স কলেজের ছাত্রী ছিলেন মৃদুলা। অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্রী মৃদুলা ছিলেন একজন দক্ষ অ্যাথলিট ও সাঁতারুও। ২৪ বছর বয়সী রোড্‌স স্কলার ডাঃ মৃদুলা শাস্ত্রীর বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল নিউ ইয়র্কে, তাঁর বন্ধুর কাছে। বন্ধুর সঙ্গেই কাটাবেন বড়দিনের ছুটি, এ-কথা জানিয়ে তারও করে দিয়েছিলেন তাঁকে। কিন্তু ভিসা না পাওয়াতে পিছিয়ে দিতে হয় যাওয়া। শেষ পর্যন্ত ভিসার সমস্যা মিটতে ২১ ডিসেম্বরের ফ্লাইটে টিকিট বুক করেন তিনি। যদি আর একদিন আগে মিটত ভিসার সমস্যা, কিংবা আর একদিন পরে, তা হলে মৃদুলাকে থাকতে হত না ওই অভিশপ্ত উড়োজাহাজে। ওঁর নাইজেরীয় সহপাঠী মোজিমিনিই প্রথমে কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি মৃদুলার মৃত্যুর খবর। "আ কার্সড্ কোইনসিডেন্স"— এই ছিল মোজিমিনিই-র প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া।

গত ২০ বছরে যত বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে, ভয়াবহতায় তার প্রায় সবক'টিকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেই দুর্ঘটনা। স্কটল্যান্ডের ছোট এবং আপাতশান্ত লকারবি গ্রামের ওপর ভেঙে পড়েছিল প্যান অ্যাম ফ্লাইট ওয়ান-ও-থ্রি বোয়িং ৭৪৭। ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণে আকাশেই টুকরো-টুকরো হয়ে যায় নিউ ইয়র্কগামী বিশাল জাম্বো জেটটি। মাইক কারনাহান নামে এক প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শোনা গেছে, গোটা আকাশটাই লাল হয়ে গিয়েছিল বিস্ফোরণের আগুনে। "দ্য স্কাই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি রেনিং ফায়ার, ইট ওয়াজ জাস্ট লাইক লিকুইড,"— এভাবেই সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন তিনি। বিমানের জ্বলন্ত টুকরোগুলি ভেঙে পড়ে একটি 'গ্যাসোলিন স্টেশন'-এর ওপর। এতে আরও ছড়িয়ে পড়ে

"গত ২০ বছরে যত বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে, ভয়াবহতায় তার প্রায় সবক'টিকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেই দুর্ঘটনা। স্কটল্যান্ডের ছোট এবং আপাতশান্ত লকারবি গ্রামের ওপর ভেঙে পড়েছিল প্যান অ্যাম ফ্লাইট ওয়ান-ও-থ্রি বোয়িং ৭৪৭। ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণে আকাশেই টুকরো-টুকরো হয়ে যায় নিউ ইয়র্কগামী বিশাল জাম্বো জেটটি।"

ফোটো : পিটিআই

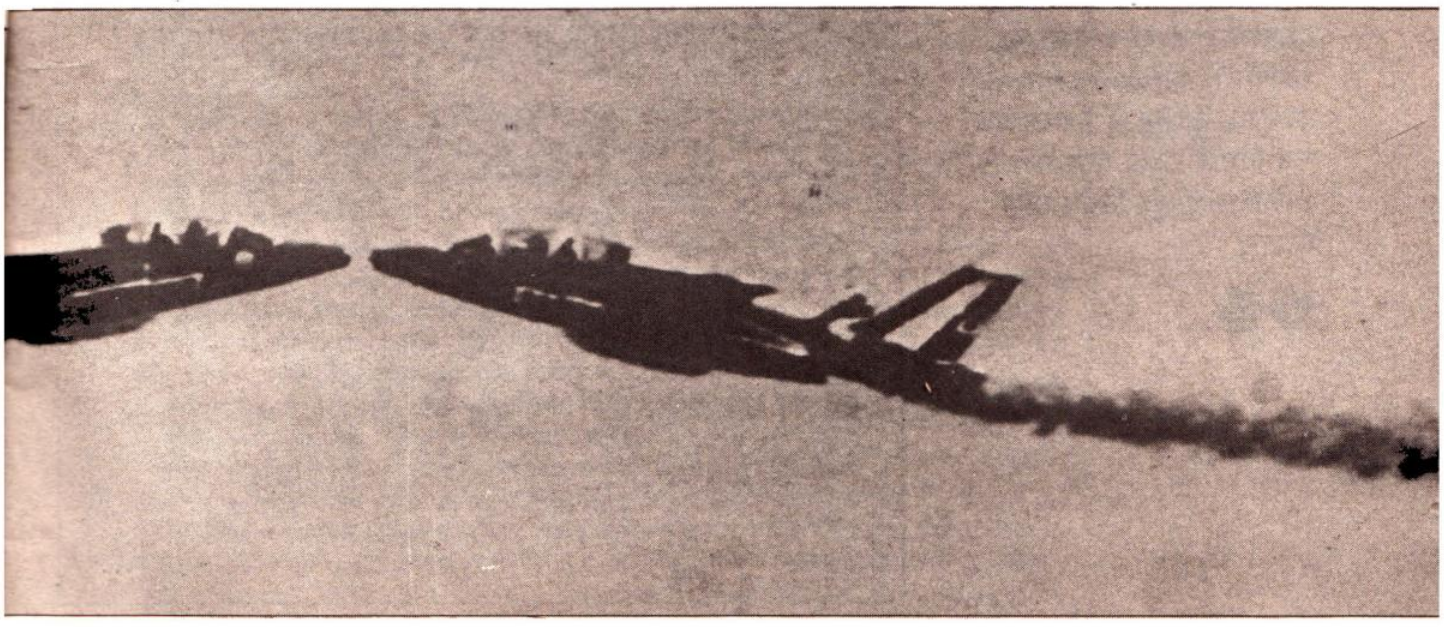

আকাশে ওড়ার আগে ফোটো : অলক মিত্র

বিমানের ভেতরে যাতে চট করে আগুন না লাগে তার জন্য অনেক দেশেরই সরকার এখন নিয়ম করেছেন, ১,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে এমন জিনিস দিয়ে তৈরি করতে হবে বিমানের কেবিন। ১৯৮৬ সালের পর কানাডা, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের যত বিমান তৈরি হয়েছে তার প্রতিটিতেই এই নিয়ম মানা হয়েছে।

আগুন। বি বি সি টেলিভিশনকে দেওয়া এক টেলিফোন-সাক্ষাৎকারে মাইক কারনাহান জানান, সেই অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়িই পরিণত হয়েছিল পোড়া কাঠ আর কংক্রিটের স্তূপে। ঘটনার আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী হোটেল-মালিক গ্রাহাম বিয়ারলি জানিয়েছেন, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে যখন ভেঙে পড়ছিল হোটেলের দেওয়াল ও ছাদ, প্রথমে তিনি ব্যাপারটাকে ভেবেছিলেন ভূমিকম্প। বেরিয়ে এসে দেখতে পান, মাটি থেকে ১০০ মিটার উঁচু আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠছে জ্বলন্ত এঞ্জিনটি থেকে। জন গ্লাসগো নামে একজনের কথায়, প্রায় দেড় কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ভাঙা বিমানটির জ্বলন্ত টুকরো। বিস্ফোরণের অভিঘাতে ও আগুনে এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল যাত্রীদের দেহ যে মৃতদেহ শনাক্তকরণের প্রশ্নই ছিল না। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে নিউ ইয়র্কের জন এফ. কেনেডি বিমানবন্দরে এসেছিলেন অভিশপ্ত বিমানটির যাত্রীদের অসংখ্য আত্মীয়স্বজন।

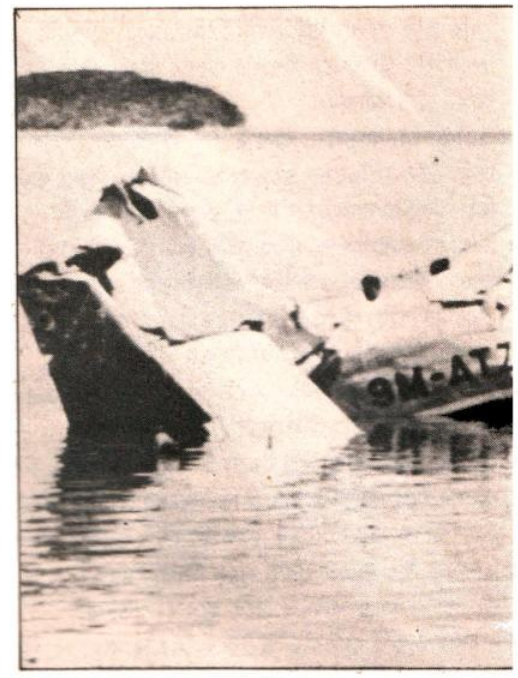

সমুদ্রের জলে আছড়ে পড়েছে বিমান

তাঁদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছিল বিমানবন্দরের লাউঞ্জ। 'রেডক্রশ'-এর ডেবরা রিকিয়ার্ডি, কার্লা আবেল ও আরও কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবিকা, যাঁরা ভিড় সামলাচ্ছিলেন, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত অপেক্ষমাণ মানুষের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মাথা নিচু করে অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হন। তথ্যকেন্দ্রের কাউন্টারের সামনে উন্মত্তপ্রায় এক যুবক এসেছিল জানতে তার আত্মীয়ের নাম মৃতদের তালিকায় আছে কি না। ফোটোগ্রাফাররা তাকে ঘিরে ধরতে সে ঘুসি মেরে ভেঙে দেয় একজনের ক্যামেরা। তবে মন ছুঁয়ে যায় একজন মায়ের

আকাশপথে দুর্ঘটনা এড়াল কলম্বিয়ার বিমান

মাঝেমধ্যেই শোনা যায় আকাশে চিলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বোয়িং বিমান। অত বড় একটা প্লেন সামান্য একটা পাখির ধাক্কাতেই কী করে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, এ এক বিস্ময়! আসলে, চিল শুধু নয়, ছোট একটি চড়াই পাখিও বিমান ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠতে পারে। কোনওভাবে যদি পাখিটি এসে পড়ে প্লেনের প্রপেলারের সামনে, তা হলে হাওয়ার তীব্র টানে তা ঢুকে যায় প্রপেলারের ভেতর। আর তখনই ঘটে বিপত্তি। আর মাঝ-আকাশে যদি মুখোমুখি ধাক্কা লাগে দুই বিমানের, তা হলে তো কথাই নেই। অত প্রচণ্ড গতিতে উলটো দিক থেকে ছুটে আসা বিমানটিকে পাশ কাটাবার সময়ও পান না পাইলট। অবশ্য নেহাত দৈবক্রমেই বেঁচে গিয়েছিল কলম্বিয়ার স্যাম জেট বোয়িং-৭২৭। মাটি থেকে ৩৬০০ মিটার উঁচুতে আন্তিয়োকুইয়া অঞ্চলের ওপর দিয়ে উড়ছিল বিমানটি। বিমানের ভেতর ৭৫ জন যাত্রী ছিলেন। হঠাৎই পাইলট দেখতে পান একেবারে মুখোমুখি ছুটে আসছে মার্কিন মিলিটারি বাহিনীর একটি টহলদার জেট। সঙ্গে-সঙ্গে নিকটবর্তী মেডেলিন বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন পাইলট। হাতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। কন্ট্রোলের নির্দেশ পেয়ে তা অনুসরণ করারও সময় নেই। চোখের পলকে ধেয়ে এল মিলিটারি বিমানটি, এবং মাত্র ২০০ গজ দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল তীরবেগে। যদি এক চুলের এদিক-ওদিক হত, তা হলে মাঝ-আকাশে ঘটে যেত বিরাট দুর্ঘটনা, যেমনটি হয়েছিল কানারি দ্বীপপুঞ্জের কাছের ঐতিহাসিক দুর্ঘটনাটিতে।

একটিমাত্র কথা। সাইরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত তাঁর ২১ বছরের ছেলে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮ জন ছাত্রছাত্রীর একটি বড় দল চলেছিল সেই বিমানে। সাংবাদিকদের অসংখ্য "হোয়াট ইজ ইয়োর রিঅ্যাকশন" জাতীয় অর্থহীন প্রশ্ন আর ক্যামেরা ফ্ল্যাশের মুহুর্মুহু ঝলসে ওঠার মধ্যে বড় ক্লান্ত, বড় করুণ দুটি চোখ তুলে শুকিয়ে আসা ঠোঁট নেড়ে তিনি বলতে পেরেছিলেন মাত্র কয়েকটি শব্দ— "মাই সন ইজ ডেড, হোয়াট এল্‌স ডু ইউ ওয়ান্ট ?"

মন ছুঁয়ে যায় জাপানের হিরোতোসগু কোয়াগুচির শেষ চিঠিটিও। প্লেনে আগুন ধরে যাওয়ার পর যখন ধোঁয়া বেরোচ্ছে গলগল করে, প্রচণ্ড দুলতে দুলতে প্লেন যখন দ্রুত গতিতে নেমে আসছে মাটির দিকে, তখনই, মৃত্যুর মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে চিঠি লিখছিলেন কোয়াগুচি। মৃত্যুকে অত কাছ থেকে দেখতে-দেখতেও মারিকো, শুওচি ও চিওকোকে তিনি বলতে ভোলেননি ভাল ভাবে মিলেমিশে থাকার আর মাকে সাহায্য করার কথা। চিঠির তৃতীয় অনুচ্ছেদে তিনি স্ত্রীকে লিখছেন, "গুডবাই, সায়োনারা.....তুমি ছেলেমেয়েদের দেখো। এখন ৬-৩০ মিনিট। প্লেন প্রচণ্ড দুলছে। নামছে দ্রুত গতিতে। আমি কৃতজ্ঞ, আমি জীবনে সত্যিকারের সুখী মানুষ ছিলাম। এই সেই জীবন যা আমি এখনও উপভোগ করছি। কিন্তু তারপর...." এখানেই থেমে গেছে কোয়াগুচির কলম। এখানেই থেমে গেছে আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের প্রতি একজন মানুষের লিখে রেখে যাওয়া শেষ শুভেচ্ছাবার্তা।

সারা বিশ্বে গত ২০ বছরে প্রায় ১৮ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে বিমান দুর্ঘটনায়। গত শতাব্দীতে সমুদ্রযাত্রায় যেমন ভয় ছিল টাইফুন, সাইক্লোন আর জলদস্যুর, আজকের বিমানযাত্রায় প্লেন-ক্র্যাশের ভয় তার চেয়ে কিছু কম নয়। এর ওপর আছে মাঝ-আকাশে হাইজ্যাকিং-এর ভয়ও। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত হাজার-হাজার মানুষ পৃথিবীর নানা বিমানবন্দর থেকে প্লেনে চড়েন। আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা এমনই যে, হাজার-হাজার মাইল পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য এখন বিমানের সাহায্য নিতেই হয়। হয়তো বিমানে ওঠার মুহূর্তে প্রত্যেকেই বুকের ওপর এঁকে নেন ক্রশচিহ্ন, অস্ফুটে বলে ওঠেন "আমেন"। কিন্তু, তাই বলে এ-কথাও ঠিক নয় যে, প্রতি যাত্রাতেই মনের মধ্যে পুষে রাখতে হবে মৃত্যুভয়। মনে রাখা উচিত, দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। রোজই কত অসংখ্য বিমান রানওয়ে ছেড়ে আকাশে ওঠে, আবার নির্বিঘ্নে নেমেও আসে মাটিতে।

বিমান দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে উঠেপড়ে লাগে বিমান প্রস্তুতকারক কোম্পানি ও সে-দেশের সরকার। দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ খুঁজে বের করার কাজে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে ভেঙে পড়া বিমানটির ব্ল্যাক বক্স। কমলা রঙের ওই ছোট বাক্সটির মধ্যে ধরা থাকে নিকটতম বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের সঙ্গে অভিশপ্ত বিমানের পাইলটের শেষ বার্তাবিনিময়ের রেকর্ড করা টেপ। এমনকী মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্তও অনেক পাইলট জানিয়ে যেতে চেষ্টা করেন, দুর্ঘটনাগুলির কারণ। অতীতের বিমান দুর্ঘটনাগুলির ককপিট ভয়েস রেকর্ডার ঘেঁটে দেখা

> "ফ্লাইট মিস করে হতভম্ব বসুতা তখনও বুঝে উঠতে পারেননি কোথায় যাবেন, কী করবেন। লাউঞ্জে বসে থাকতে-থাকতেই তাঁর কানে এল মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার খবর। খবরটা পেয়ে কয়েক মুহূর্তের ঘোর কাটিয়ে তিনি কেবল বলতে পেরেছিলেন, "হে ঈশ্বর।"

বিমান সমুদ্রে, বেঁচে গেলেন যাত্রীরা

খবরের কাগজে প্রায়ই শিরোনাম হয় হাড়-হিম-করা নানা বিমান দুর্ঘটনার খবর, কিন্তু পাইলটের একক কৃতিত্বে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ থেকে ফিরে আসার ঘটনাও কম নেই। ১৯৯৩ সালের ৪ নভেম্বর তাইওয়ানের একটি যাত্রিবাহী জাম্বো জেট অবতরণের সময় রানওয়ে থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ে সমুদ্রে। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মুখ থেকে অবিশ্বাস্য ভাবে বেঁচে ফেরেন ২৯৬ জন আরোহী। হংকং-এর কাইটাক বিমানবন্দরের রানওয়েটি পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে সমুদ্রের বুক চিরে অনেকখানি চলে গিয়েছে। এখানে নিরাপদে বিমান নামানো অনেক পাইলটের কাছেই একটা চ্যালেঞ্জ। সেদিন সকাল থেকেই হংকংয়ের আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত খারাপ। বৃষ্টির সঙ্গে বইছিল ঝোড়ো হাওয়াও। অবতরণের সময় বিমানের পাইলট বোধ হয় কুয়াশা বা মেঘলা আবহাওয়ার জন্য ভালভাবে ঠাহর করতে পারেননি রানওয়ের সীমানা। ভেজা রানওয়েতে নামতে গিয়ে হড়কে বিমানটি ঢুকে যায় সমুদ্রে। কিন্তু পাইলটের স্নায়ুর ওপর আশ্চর্য নিয়ন্ত্রণ ও দুর্দান্ত পেশাদারি দক্ষতায় অর্ধেক জলে ও অর্ধেক ডাঙায় আটকে যায় প্লেনটি। আশ্চর্যের কথা, যাত্রীদের ঝাঁকুনিও অনুভব করতে দেননি তিনি। ইতিমধ্যে প্লেনের পেছন দিকটি ভেঙে কেবিনের মধ্যে জল ঢুকতে থাকে হুড়মুড়িয়ে। পাইলট এবং 'এয়ার-ক্রু'দের দক্ষতায় সমস্ত যাত্রীকে নিরাপদে বের করে নৌকোর সাহায্যে ডাঙায় পৌঁছে দেওয়া হয়।

ভেঙে পড়া বিমানের একটি অংশ নিয়ে চলছে পরীক্ষা
ফোটো : এপি

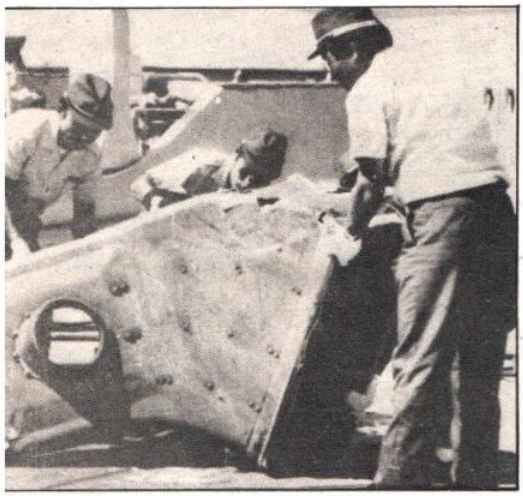

> প্রায় দেড় কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ভাঙা বিমানটির জ্বলন্ত টুকরো। বিস্ফোরণের অভিঘাতে ও আগুনে এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল যাত্রীদের দেহ যে মৃতদেহ শনাক্তকরণের প্রশ্নই ছিল না।

গেছে, দুর্ঘটনার মূলে থাকে কেবিনে আগুন লেগে যাওয়া, যান্ত্রিক গোলযোগ, টাচ-ডাউন অর্থাৎ বিমান মাটি ছোঁওয়ার সময়ের নানা অসুবিধে, কন্ট্রোলের সঙ্গে সময়মতো যোগাযোগের অভাব বা কন্ট্রোল থেকে পাঠানো নির্দেশের ভুলত্রুটি, আকাশপথে দুই বিমানের সংঘর্ষ ও উড়ন্ত পাখির সঙ্গে ধাক্কা। এ ছাড়াও থাকে আরও দুটি বড় বিপদের ঝুঁকি। হাইজ্যাকিং ও অন্তর্ঘাত। বিমান দুর্ঘটনার ইতিহাসে এ পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে ১৯৭৭ সালের ২৭ মার্চ। স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের ওপর আকাশপথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে দুটি বোয়িং বিমানের। নিহত হন ৫৮২ জন যাত্রী। এর আগে ১৯৭৪ সালে প্যারিসের ২৬ মাইল উত্তর-পূর্বে তুর্কি 'ডি-সি- ১০'বিমান ভেঙে প্রাণ হারান ৩৪৬ জন। ১৯৮৫ সালের ২৩ জুন এয়ার ইন্ডিয়া-র বোয়িং 'কনিষ্ক' আয়ারল্যান্ড উপকূলের কাছে ৩২৯ জন যাত্রীসহ তলিয়ে যায় সমুদ্রের অতলে। অবশ্য এটি ছিল অন্তর্ঘাতের ঘটনা। ১৯৮০ সালের ১৯ অগস্ট সৌদি আরবের রিয়াধ বিমানবন্দরে

বিমানে আগুন লেগে যাওয়ার পর যাত্রীদের নিরাপদে বার করে আনা

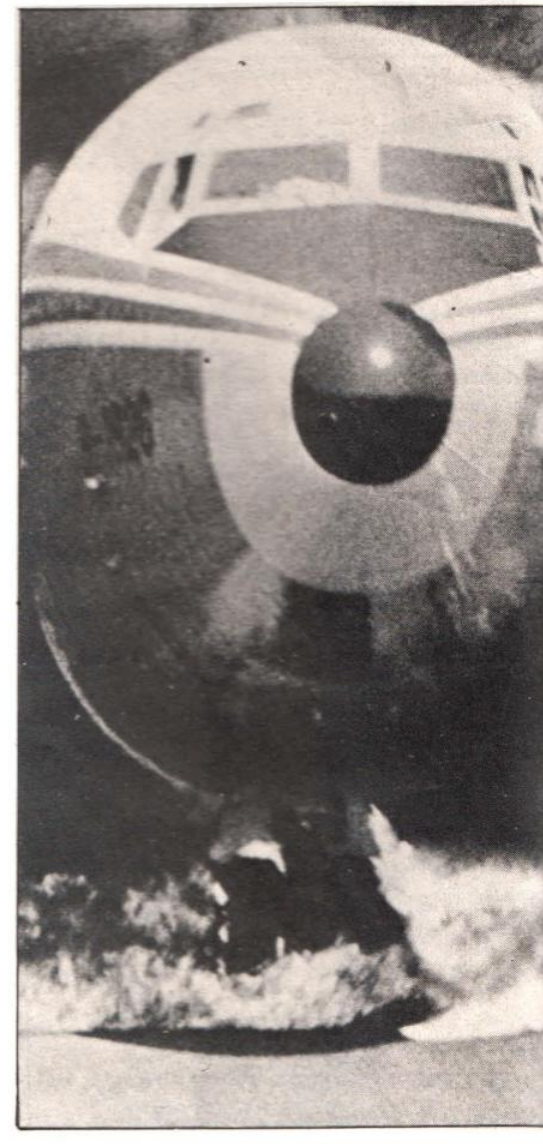

ক্র্যাশ ল্যান্ডিং বা জরুরি অবতরণ করতে গিয়ে ভেঙে পড়ে সে-দেশেরই একটি বিমান। প্রাণ হারান ৩০১ জন যাত্রী। বড় মাপের বিমান দুর্ঘটনার এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। ১৯৮৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঘটেছিল এরকমই এক মর্মান্তিক ঘটনা। শাখালিন দ্বীপের কাছে ভুল করে রুশ আকাশসীমায় ঢুকে পড়েছিলেন কোরিয়ান এয়ার লাইন্স-এর বোয়িং ৭৪৭-এর পাইলট। নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত ছিল সেই ভুল। টহলদার সোভিয়েত যুদ্ধ-বিমান সেই পাইলটকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে নিরপেক্ষ আকাশসীমা দিয়ে চলে যেতে বলতে পারত। কিন্তু কোনওরকম সতর্কীকরণ ছাড়াই কোরিয়ার বিমানটিকে গুলি করে নামায় সোভিয়েত যুদ্ধ-বিমান। মারা যান নিরাপরাধ ২৬৯ জন যাত্রী, আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও রাজনৈতিক তিক্ততার হাজার মাইল দূরে যাঁদের অবস্থান। যে সোভিয়েত গোলন্দাজ সেদিন ধ্বংস করেছিলেন ২৬৯ জন সাধারণ মানুষের জীবন, নিজের বিবেকের কাছে কী কৈফিয়ত তিনি দিয়েছিলেন তা জানা যায়নি। ১৯৮৩ সালে দুবাই-এর কাছে গাল্‌ফ এয়ারওয়েজ-এর একটি বিমান দুর্ঘনায় পড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এফ-বি-আই পরে তদন্ত করে সিদ্ধান্তে আসে, যান্ত্রিক গোলযোগ নয়, 'সাবোতাজ'ই ছিল তার কারণ। বিমানে ওঠার জন্য যে ১১২ জন টিকিট কেটেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন 'লাগেজ' পাঠিয়ে দিয়ে শেষ মুহূর্তে আর আসেননি। সন্দেহ করা হয় ওই লাগেজের ভেতরই ছিল বোমা। মৃত্যু হয় বাকি ১১১ জনের।

তবে অন্তর্ঘাতজনিত বিমান দুর্ঘটনাগুলির মধ্যে ভয়াবহতায় আর সব ঘটনাকে ছাড়িয়ে গেছে ভারতীয় বিমান 'কনিষ্ক'-এর দুর্ঘটনা। ১৯৮৫ সালের ২৩ জুন আয়ারল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল থেকে ১১০ মাইল দূরে অতলান্তিকের ওপর ভেঙে পড়েছিল এয়ার-ইন্ডিয়ার জাম্বো জেট 'কনিষ্ক'। মারা গিয়েছিলেন ৩২৯ জন যাত্রী। দুর্ঘটনার কারণ খুঁজে বের করার জন্য গঠিত হয়েছিল 'কিরপান কমিশন'। ভাবা পারমাণবিক কমিশনের পাঁচজন বিজ্ঞানীকেও অনুরোধ করা হয়েছিল দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার। সকলেই মত দেন, যান্ত্রিক গোলযোগ নয়, বিমানের ভেতরে রাখা বিস্ফোরকই দুর্ঘটনার কারণ। টরোন্টো বিমানবন্দরের নড়বড়ে নিরাপত্তা-ব্যবস্থাই নাকি এর জন্য দায়ী। যেভাবে একটি বিস্ফোরক-বোঝাই সুটকেস নিরাপত্তাকর্মীদের চোখের সামনে দিয়ে বিমানে উঠে গেছে, তাতে মনে হতে পারে এই ধরনের অন্তর্ঘাত ঘটানো কোনও ব্যাপারই নয়। এ-ঘটনার পর থেকেই নড়েচড়ে বসে আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিবহণ কর্তৃপক্ষ। বাড়িয়ে দেওয়া হয় চেকিং-এর কড়াকড়ি, প্রতিটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের ট্রানজিট পয়েন্টগুলিতে চালু করা হয় সর্বোচ্চ সতর্কতা। কনিষ্ক দুর্ঘটনার পর থেকে লণ্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে যে-কোনও এয়ার-ইন্ডিয়ার বিমান অবতরণ করামাত্র সশস্ত্র পুলিশ বিমানটিকে ঘিরে পাহারা দেয়।

> এঞ্জিন যত জোরে ঘোরে আর যত ঘাত উৎপন্ন করে তার অনুপাতে এঞ্জিনের গোঙানির কম্পাঙ্ক বাড়ে-কমে। পাম-৯০-তে এই গোঙানির কম্পাঙ্ক উঠেছিল সর্বোচ্চ ৩২৫০ হার্জ। কিন্তু সহজভাবে 'টেক-অফ' করতে এই কম্পাঙ্ক হওয়া দরকার অন্তত ৩,৮৫০ হার্জ। দুর্ঘটনার দিন বিমানের ডানা ও ফিউজল্যাগে তুষারপাতের দরুন ১৪,০০০ পাউন্ড ঘাত উৎপন্ন হওয়া দরকার। কিন্তু পাম-৯০ মাত্র ১০,৭৫০ পাউন্ড ঘাত তুলেই টেক-অফ করেছিল। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় শক্তি উৎপাদন হয়েছিল ১৫ শতাংশ কম।

আকাশপথে ট্র্যাজেডি : একে এড়ানোর কি কোনও উপায় নেই
ফোটো : জিতেন্দর গুপ্তা

'ট্যাক্সিইং' করতে গিয়ে

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিমান দুর্ঘটনা ঘটে আকাশে অথবা টেক-অফ কিংবা টাচ-ডাউনের সময়। 'ট্যাক্সিইং' তুলনামূলকভাবে কম বিপজ্জনক। কিন্তু ট্যাক্সিইং-এর সময়ও ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা। টেক-অফের পক্ষে প্রয়োজনীয় গতি সঞ্চয় করার জন্য রানওয়ে দিয়ে বিমানকে ছুটতে হয় বেশ কিছুটা সময়। এ যেন লং জাম্প বা হাই জাম্পের আগে অ্যাথলিটদের ছুটে আসা। মাটি ছাড়ার আগে বিমানের এই দৌড়কেই বলে ট্যাক্সিইং। রানওয়ে দিয়ে উড়বার জন্য বিমান যখন দৌড়য় তখন তার গতি হয় ঘন্টায় ৩০০ কিলোমিটারের মতো। এই গতিতে ছুটতে-ছুটতে কোনও বিমান যদি ধাক্কা মারে অন্য কোনও বিমানে, তা হলে দুটি বিমানের ধ্বংস হওয়া অনিবার্য। এরকমই এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১৯৮৩ সালের ৭ ডিসেম্বর। মাদ্রিদ এয়ারপোর্টে উড়বার জন্য দৌড় শুরু করেছিল একটি বোয়িং-৭২৭। রানওয়ের ওপর কুয়াশা জমে থাকায় পাইলট দেখতে পাননি, সে-সময় রাস্তা পার হচ্ছে একটি 'আভিয়াকো ডি-সি-৯' বিমান। ৩০০ কিলোমিটার গতিতে বোয়িং সোজা গোত্তা মারে আভিয়াকো বিমানটির পেটে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন লেগে যায় দুটি বিমানেই। বিধ্বংসী সেই দুর্ঘটনায় মারা যান বোয়িং-এর ১০৪ জন যাত্রী। কপাল ভাল যে, আভিয়াকো বিমানটিতে তখন কোনও যাত্রী ছিলেন না। থাকলে, নিশ্চিতভাবেই আরও বাড়ত নিহতের সংখ্যা।

> মন ছুঁয়ে যায় জাপানের হিরোতোসগু কোয়াগুচির শেষ চিঠিটিও। প্লেনে আগুন ধরে যাওয়ার পর যখন ধোঁয়া বেরোচ্ছে গলগল করে, প্রচণ্ড দুলতে দুলতে প্লেন যখন দ্রুত গতিতে নেমে আসছে মাটির দিকে, তখনই, মৃত্যুর মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে চিঠি লিখছিলেন কোয়াগুচি।

বিমান দুর্ঘটনার আর-একটি বড় কারণ হল টেক-অফ আর টাচ-ডাউনের সময়ের ভুলভ্রান্তি। অভিজ্ঞ পাইলটরা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন, মাটি থেকে চাকা তুলে নেওয়া ও মাটিতে চাকা ছোঁয়ানোর মুহূর্তদুটিই সবচেয়ে বিপজ্জনক। বিমান যখন রানওয়েতে নামে তখন রানওয়ে থাকা চাই পরিষ্কার, আকাশ থেকে রানওয়ের দৃশ্যমানতা (পাইলটদের ভাষায়, 'ভিজিবিলিটি') হওয়া চাই সর্বোচ্চ মানের। রানওয়েতে পড়ে থাকা সামান্য একটু ইটের টুকরো কিংবা একটা দড়িও মুহূর্তে হয়ে উঠতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনার কারণ। আবার অনেক সময় বিমানকে বিশেষ কারণে জরুরি অবতরণও করাতে হয়। এখানেও থাকে মস্ত ঝুঁকি। 'এমার্জেন্সি ল্যান্ডিং' বা আপতকালীন অবতরণ করতে গিয়ে কত যে ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার ইয়ত্তা নেই। ১৯৮৫ সালের ১২ অগস্ট জাপান এয়ারলাইন্স-এর একটি বিমান ৫২৪ জন যাত্রী নিয়ে টোকিয়ো থেকে হানেদা যাচ্ছিল। মাঝ-আকাশে হঠাৎ কী করে যেন ভেঙে যায় কেবিনের ডান দিকের দরজা। আপতকালীন অবতরণ করতে গিয়ে পাইলটের হিসেবের ভুলে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যায় বিমানটি। এ-ঘটনার কয়েকদিন আগেই আমেরিকার ডালাস বিমানবন্দরে ডেলটা এয়ারলাইনসের একটি জাম্বো জেট প্রবল বৃষ্টির মধ্যে রানওয়েতে নামতে গিয়ে 'স্কিড' করে সজোরে আছড়ে পড়ে একটি জলের ট্যাঙ্কের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে মারা যান বিমানের ৩০০ জন যাত্রী। সে-বছরেরই জুন মাসে উত্তর-ইয়েমেন থেকে নিকারাগুয়া যাওয়ার পথে একটি 'ফকার-ফ্রেন্ডশিপ' বিমান জরুরি অবতরণ করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। মাঝ-আকাশে জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার জন্য বরফের প্রান্তরের ওপর বিমানটি নামাতে চেষ্টা করেছিলেন পাইলট। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি। প্রায় এরকমই একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১৯৮৪ সালের ৫ অগস্ট, ঢাকা বিমানবন্দরে। সেদিন বাংলাদেশ বিমানের একটি 'ফকার এফ-২৭' অবতরণের চেষ্টা করছিল বৃষ্টির মধ্যেই। রানওয়ে ছিল জলে ভর্তি। ঝুঁকি নিয়ে অবতরণ করতে গিয়ে বিমানটির ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি পাইলট। রানওয়ে ছেড়ে বিমানটি গিয়ে পড়ে পাশের এক জলাভূমিতে। মারা যান ৪৯ জন যাত্রী।

বিমানের কেবিনে বা ককপিটের কোনও যন্ত্রাংশে আগুন লেগেও হতে পারে বিস্ফোরণ। ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে ও আগুনে পুড়ে মারা যান যাত্রীরা। গত ৪০ বছরে বিমান দুর্ঘটনায় যত লোকের মৃত্যু হয়েছে তার ৬০ শতাংশই আগুনে পুড়ে বা ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে। এরকমই এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল পাকিস্তানের একটি বোয়িং বিমানে। বিমানের পেছন দিকে আগুন লাগলে ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য যাত্রীরা ভিড় করেছিলেন সামনের দিকে। এর ফলে যাত্রীদের ভারে প্লেনটি নামতে শুরু করে হুড়মুড় করে। পাইলটের সমস্ত চেষ্টা বিফল করে প্রায় ২৫ হাজার ফুট নেমে এসে বিমানটি মুখ থুবড়ে পড়ে মাটিতে। ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে ১৫৬ জন যাত্রীর প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার ঘটনা সত্যিই মর্মান্তিক। বিমানের ভেতরে যাতে চট করে আগুন না লাগে তার জন্য অনেক দেশেই সরকার এখন নিয়ম করেছেন, ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে এমন জিনিস দিয়ে তৈরি করতে হবে বিমানের কেবিন। ১৯৮৬ সালের পর কানাডা, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের যত বিমান তৈরি হয়েছে, তার সবকটিতেই এই নিয়ম মানা হয়েছে।

এছাড়াও আরও অনেকভাবেই হয়তো এড়ানো যায় বিমান দুর্ঘটনা।

বৈমানিকের মুহূর্তের ভুলে যাতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্কতাও অবলম্বন করা দরকার। সব রকমের সতর্কতা যদি নেওয়া হয়, তা হলে নিশ্চয়ই কমে আসবে বিমান দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

কুইজ

ফিরে এলেন রিঙ্গো স্টার

প্রাক্তন বিট্‌ল্‌স-তারকা রিঙ্গো স্টার তৈরি করেছেন নতুন দল 'অল স্টার ব্যান্ড'। ইউরোপে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই দলটি।

যদি রিচার্ড স্টার্‌কি-র আসল পরিচয় জিজ্ঞেস করা হয়, তবে অনেকেই হয়তো চুপ করে থাকবেন। ছয়ের দশকে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার হাজার-হাজার মানুষকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন এই ড্রামবাদক—এ-কথা জানার পরও কিন্তু অনেকেই চিনতে পারবেন না তাঁকে। কিন্তু যদি এ-ভাবে প্রশ্নটা করা হয়, বিট্‌ল্‌স দলের ড্রামার কে ছিলেন, তা হলে সঙ্গে-সঙ্গেই সবাই বলে দেবেন, রিঙ্গো স্টার। এই রিঙ্গো স্টারেরই আসল নাম রিচার্ড স্টার্‌কি। এক সময় জন, পল, জর্জ আর রিঙ্গো—এই চারটি নাম প্রায় মুখে-মুখে ঘুরত। পপ গানের বিষয়ে সামান্য খোঁজখবরও যাঁরা রাখেন, তাঁরা সকলেই জানেন প্রথম তিনজন কারা। জন লেনন, পল ম্যাকার্টনি ও জর্জ হ্যারিসন। বেশি দিন আগের কথা নয়, যখন এঁদের গান শোনার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষ হাজার-হাজার ডলার খরচ করতেও রাজি থাকতেন। পরে নানা কারণে বিট্‌ল্‌স দলটি ভেঙে যায়। কিন্তু সম্প্রতি আবার ফিরে এসেছেন বিট্‌ল্‌স ড্রামার রিঙ্গো স্টার। তিনি তৈরি করেছেন নতুন দল 'অল স্টার ব্যান্ড'। অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দলটি। ১৯৯২ সালের ৭ জুলাই লিভারপুল-এ একটি অনুষ্ঠানে ২,০০০-এরও বেশি মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন তাঁদের প্রিয় পপ তারকাকে। সেই অনুষ্ঠানে রিঙ্গো গেয়েছিলেন বিট্‌ল্‌স-এর বিখ্যাত গান 'ইয়েলো সাবমেরিন', 'ইউ আর সিক্সটিন', 'ফোটোগ্রাফ', 'আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট' প্রভৃতি। ছয়ের দশকে এই গানগুলি লিখেছিলেন জন লেনন। এই অনুষ্ঠানের পর রীতিমত 'নস্টালজিয়া'য় ভুগতে শুরু করে গোটা লিভারপুল শহর। 'বিট্‌ল্‌ম্যানিয়া ইজ ব্যাক', 'রিঙ্গো ইজ রিবর্ন' এই শিরোনামে প্রথম পাতায় সেই অনুষ্ঠানের খবর ছাপে কয়েকটি সংবাদপত্র। খবরের শুরুতে মোটা হরফে লেখা হয়েছিল, "প্রায় দুই দশকের নীরবতার পর আবার ফিরে এসেছে বিট্‌ল্‌স-এর যুগ, ফিরে এসেছে দুই দশক আগের সোনালি স্মৃতির দিনগুলি।" অথচ আশ্চর্যের কথা, জন লেনন, পল ম্যাকার্টনি ও জর্জ হ্যারিসন জনপ্রিয়তায় অনেক এগিয়ে ছিলেন রিঙ্গোর তুলনায়। ওই চারজনের মধ্যে রিঙ্গোকেই চিনতেন সবচেয়ে কম লোক। তাঁর মাত্র দু'টি গান—'অক্টোপাসেস গার্ডেন' এবং 'ডোন্ট পাস মি বাই' জায়গা পেয়েছিল বিট্‌ল্‌স অ্যালবামে। বিট্‌ল্‌স-এর চারনম্বর কণ্ঠ হিসেবেই লোকে তাঁকে জানতেন। দলের প্রধান ড্রামবাদকও তিনি ছিলেন না, সেই জায়গাটা ছিল পিট বেস্ট-এর। এমনকী, বার কয়েক তাঁকে দল থেকে বাদও যেতে হয়। কখনও জর্জ মার্টিন, কখনও অ্যান্ডি হোয়াইট, আবার কখনও জিমি নিকলকে দিয়ে চালানো হত ড্রামারের কাজ। কিন্তু পরে হঠাৎই চিত্রটা পালটে যায়। 'স্টপ অ্যান্ড স্মেল দ্য রোজেস' এবং 'ওল্ড ওয়েভ' অ্যালবাম দু'টি ম্লান করে দেয় জনপ্রিয়তার অন্যান্য নজির। জন লেননও পরবর্তীকালে এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছিলেন "রিঙ্গো-র মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যা খুব দ্রুত কাছে টেনে নিতে পারে দর্শকদের।" কী সেই 'একটা কিছু'? আসলে মাইক্রোফোনের সামনে রিঙ্গো-র সপ্রতিভ, চমক লাগানো কথাবার্তা—এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর মায়াবি ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী স্পর্শ।

স্ত্রী বারবারা বাখ-এর সঙ্গে রিঙ্গো স্টার

ফোটো : এপি

প্র শ্ন :

(১) বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল দলের অধিনায়ক দুঙ্গা-র আসল নাম কী ?

পুষণ বসুচৌধুরী, যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল, কলকাতা।

(২) কোন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকারের জীবনীগ্রন্থের নাম 'বিয়ন্ড দ্য স্টার্স' ?

সুমন মিত্র, আন্দুল চৌধুরীপাড়া, হাওড়া।

(৩) ১৯৯৪ সালের ভারতসেরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছেন কারা ?

প্রমিত সাহা, পি.এন. রোড, কোচবিহার।

(৪) কোন দেশের জাতীয় পতাকা সবচেয়ে পুরনো ?

রথীন্দ্রনাথ দে, কোন্নগর, হুগলি।

(৫) ক্ষেপণাস্ত্রের জগতে 'গ্র্যাণ্ড স্লাম' শব্দটির আছে এক বিশেষ তাৎপর্য। বলতে পারো, সেটি কী ?

অম্লান চক্রবর্তী, মাথাভাঙা, কোচবিহার।

(৬) ঋত্বিক ঘটকের একটি ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি গাড়ি। কোন ছবি ?

অমর্ত্য পাল, কুদঘাট, কলকাতা।

(৭) সত্যজিৎ রায়ের কোন ছবিতে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও ওয়াহিদা রহমান ?

এই চিত্রকরের ঘোড়ার স্কেচ বিখ্যাত

অর্ঘ্যপ্রসূন ঘোষ, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা।

(৮) এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেন টুর্নামেন্টে ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন কে ?

বিশ্বজিৎ নন্দী, গরফা, কলকাতা।

(৯) 'দ্য ওয়াল' নামে বিখ্যাত মিউজিক অ্যালবামটি কার ?

অভিজিৎ ঘোষ, একব্বরপুর, হাওড়া।

(১০) কে গেয়েছেন 'বর্ণ ইন দ্য ইউ.এস.এ' গানটি ?

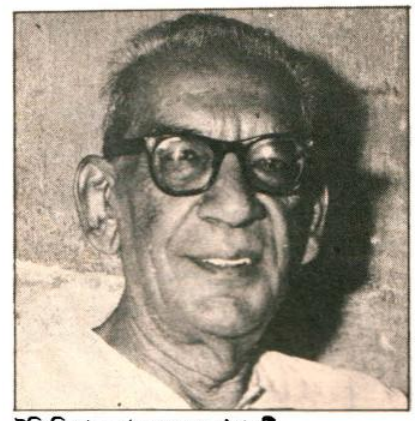

ইনি লিখেছেন 'মরু ও সঙ্ঘ' গল্পটি

মৌমিতা রায়, মেদিনীপুর মিশন বালিকা বিদ্যালয়, মেদিনীপুর।

(১১) 'স্টেলমেট' কথাটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ?

দীপাঞ্জন সেনগুপ্ত, কাঁকুলিয়া ব্যানার্জিপাড়া, কলকাতা

(১২) এখন জে.সি.টি-তে খেলছেন বিজয়ন। এঁর পুরো নাম কী ?

দিব্যজ্যোতি ভট্টাচার্য, তিনসুকিয়া, অসম।

(১৩) ক্লার্ক কেন্ট একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় কমিক্সের নায়ক। এঁকে আমরা কী নামে চিনি ?

চিত্তপ্রভ রায়, ঝোড়হাট, হাওড়া।

(১৪) কে লিখেছেন 'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' বইটি ?

অর্পণ লেঙ্কা, বারিপদা, ওড়িশা।

(১৫) ঈগল কোন দেশের স্বীকৃত জাতীয় পাখি ?

তপোব্রত নন্দী, জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার।

(১৬) 'সালাম বম্বে' ছবিটি পরিচালনা করেছেন কে ?

অমলেন্দু জোয়ারদার, সিঁথি, কলকাতা।

(১৭) 'ফভিজম' একটি শিল্প-আন্দোলনের নাম এঁর পুরোধা কে ছিলেন ?

বিশ্বব্রত চক্রবর্তী, যোধপুর পার্ক, কলকাতা।

(১৮) 'আহোয়' কথাটি ব্যবহার করেন কোন পেশার মানুষরা ?

তন্ময় পালিত, সল্টলেক সিটি, কলকাতা।

(১৯) এক বাঙালি চিত্রকরের চারকোল ও কন্টি-তে আঁকা ঘোড়ার স্কেচ খুব বিখ্যাত। তাঁর নাম কী ?

অমিতেশ দাঁ, ডিব্রুগড়, অসম।

(২০) 'তৃষাগ্নি' ছবিটি নির্মিত হয়েছে এক বাঙালি ঔপন্যাসিকের 'মরু ও সঙ্ঘ' গল্পটিকে অবলম্বন করে। সেই ঔপন্যাসিকের নাম কী ?

তৃণাঙ্কুর পানিগ্রাহী, খড়্গপুর, মেদিনীপুর

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) মিখাইল গোরবাচভ।
(২) সরোজিনী নাইডু।
(৩) অ্যালান বর্ডার।
(৪) মার্ক টেলর।
(৫) ফোরিন্ট।
(৬) ইউরেনাস।
(৭) ২২৩টি।
(৮) কোনও বিখ্যাত মানুষের দেহরক্ষী।
(৯) রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাক্তন প্রধান ইউ-থান্ট।

লালা অমরনাথ

(১০) শিখা স্বরূপ।
(১১) দেবব্রত বিশ্বাস।
(১২) দাবা।
(১৩) মায়ানমার-এর আং সাং সু কি
(১৪) বার্লিনে, ১৮৭৯ সালের ৩
(১৫) নতুন ফুল।
(১৬) আকবরাবাদ।
(১৭) বালি সাগু।
(১৮) অরুণলাল।
(১৯) র‍্যাফ্লেসিয়া।
(২০) লালা অমরনাথ।

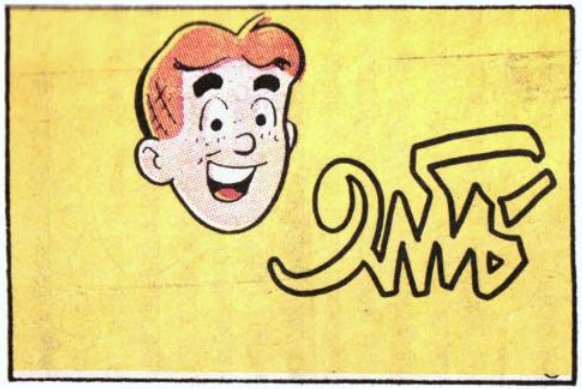
আর্চি

এখন একটা স্যান্ডউইচ হয়ে যাক ।
এখনই তো স্যান্ডউইচ খেলে !

সেইজন্যই তো আর-একটা দরকার !

চমৎকার স্যান্ডউইচ ! তবে...
"তবে" ?

মাস্টার্ড নেই । মা মাস্টার্ড কিনে আনবেন ।

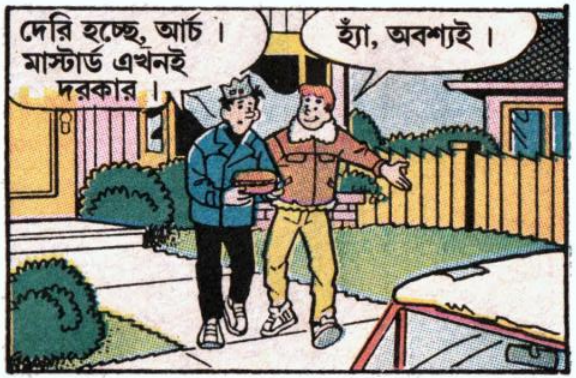
দেরি হচ্ছে, আর্চ । মাস্টার্ড এখনই দরকার ।
হ্যাঁ, অবশ্যই ।

ওই তো, মা এসে গেছেন।
আমাদের দেখে মা গাড়ি থামালেন ।

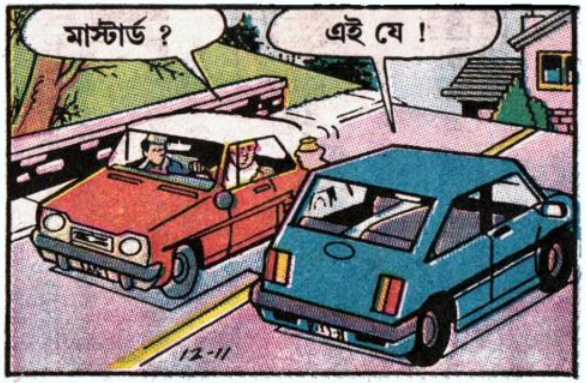
মাস্টার্ড ?
এই যে !
12-11

এতদিন জানতাম, এসব টিভি কমার্শিয়ালেই হয় !

রহস্য গল্প

রক্তমন্দিরের রত্নরশ্মি

অদ্রীশ বর্ধন

রাত আটটা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গে পাশের গলি দিয়ে বীরেন গাঙ্গুলি রোডে এসে দাঁড়াল লোকটা। বেশি বয়স নয়, অথচ হাতে রয়েছে একটা বেতের ছড়ি। হাতলটা রুপোর, গোল বলের মতো।

বাড়ি ফেরার হিড়িক শুরু হয়েছে আশপাশের দোকানে। জিনিস গুছোচ্ছে ফুটপাতের ফেরিওয়ালারা।

চৈত্র মাস। বেশ গরম পড়েছে। লোকটা তাই কলারওয়ালা নীল রঙের বাহারি গেঞ্জিটার গলা খুলে রেখেছে। ঝুলিয়ে পরেছে ব্লু জিন্‌স-এর প্যান্টের ওপর। মোজা ছাড়াই পরেছে সাদা ফোম-রবারের জুতো। হাঁটছে হনহনিয়ে। মাঝে-মাঝে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে দু'পাশের দোকানের কাচের শোকেসে। কিন্তু থামছে না।

থামল নিউ রোড আর বীরেন গাঙ্গুলি রোডের মোড়ে। জহরতের দোকানের সামনে বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে : ক্যালকাটা ডায়মন্ড এক্সচেঞ্জ।

হিরে কেনাবেচার এতবড় দেকান কলকাতায় আর দুটি নেই।

লোকটা দাঁড়িয়েছে কাচের শোকেসের ঠিক সামনে। ঝট করে দেখে নিল আশপাশে, তারপরেই হাতের ছড়ির গোল হাতল দিয়ে ধাঁই করে মারল কাচের শোকেসে।

ঝনঝন্ শব্দে কাচ যখন খানখান হচ্ছে, একই সঙ্গে তখন বিপদসঙ্কেত ঘন্টাও বেজে উঠেছে। এদিকে-ওদিকে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। তারা থ।

লোকটা কিন্তু হাত গলিয়ে দিয়েছে ভাঙা শোকেসের মধ্যে।

পেছন ফিরে পালাতে গিয়েই পেল বাধা। মোড় ঘুরে তেড়ে আসছে ট্রাফিক সার্জেন্ট। কোমরের খাপ থেকে টেনে বের করেছে রিভলভার। চেঁচিয়ে উঠেছে পেছনে এসেই।

ঘুরে দাঁড়াল হিরেচোর। সার্জেন্টের মাথা টিপ করে চালাল ছড়ির হাতল।

গরমের জন্য হেলমেট খুলে রেখেছিল সার্জেন্ট। ভারী হাতলটা পড়ল রগের ওপর। চোখের সামনে দেখল আলোর ঝলকানি। চোট লেগেছে ব্রেনে। লুটিয়ে পড়ল ফুটপাথে।

দোকানের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মস্ত চেহারার এক পুরুষমূর্তি। পরনে সাদা কুর্তা আর পায়জামা। চেঁচাচ্ছে গলার শির তুলে, "চোর : চোর !"

হিরেচোর ততক্ষণে পাশের গলিতে ঢুকে পড়েছে। দৌড়চ্ছে পাকা দৌড়বাজের মতো, এখনই উধাও হয়ে যাবে গলিঘুঁজির মধ্যে।

এই গলির মুখেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একদল লোক। এদের মধ্যে থেকে ছিটকে গেল একটি ছেলে। বয়স খুব জোর পঁচিশ। গায়ে জিন্‌স-এর জ্যাকেট আর প্যান্ট। এর পায়ে যেন ডানা লাগানো আছে। নাগাল ধরে ফেলল হিরেচোরের। দু'জনেই গড়িয়ে গেল রাস্তার ওপর।

এই সময়ে ছড়ির হাতল নেমে এসেছিল ছেলেটার মাথা টিপ করে। বজ্র-আলিঙ্গন একটু শিথিল হয়েছিল এই কারণেই। সড়াত করে পিছলে গিয়ে ফের টেনে দৌড় লাগিয়েছিল হিরেচোর। ততক্ষণে হইহই করে তেড়ে এসেছে আরও অনেকে। সকলের আগে দু'জন ট্রাফিক পুলিশ।

একটাই কথা বলেছিল হিরেচোর, "হিরে নেই আমার কাছে।"

না, হিরে পাওয়া যায়নি তার পকেটে। ভাঙা শোকেসের প্রায় সব হিরেই সে হাতিয়েছিল, চারটে হিরের আংটি আর দুটো ছোট-ছোট হিরে ছাড়া। হিরে নিয়েই তো সে দৌড়েছিল অত লোকের সামনে দিয়ে। তবে কি ঝটাপটি করার সময়ে হিরে চালান করেছে ছেলেটার পকেটে ? কে না জানে, দোসর নিয়ে ঘোরে ছিনতাইবাজরা। বিপদ দেখলেই চোরাই জিনিসপত্র চালান করে সঙ্গীদের কাছে।

কিন্তু ছেলেটাকেও সার্চ করে পাওয়া গেল না হিরে, একই সঙ্গে দু'জনকে আনা হয়েছিল থানায়।

রুপোর হাতলওলা ছড়ির মধ্যে নেই তো ?

না, সেখানেও নেই। একেবারেই নিরেট ছড়ি। রুপোর হাতলও নিরেট।

তবে কি রাস্তায় ঠিকরে পড়েছে? জনতা কুড়িয়ে নিয়েছে?

অসম্ভব। ট্রাফিক পুলিশ দু'জন সকলের আগে দৌড়চ্ছিল। রাস্তার ছড়ানো হিরে লুট শুরু হলে হট্টগোলে তাদের টনক নড়ত।

রাস্তাতেও পড়ে নেই হিরে। তন্নতন্ন করে দেখার পরেও পাওয়া যায়নি।

দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে যিনি 'চোর, চোর' বলে চেঁচিয়েছিলেন, তিনিই জহরতের দোকানটার খোদ মালিক। সেই রাতে থানায় তিনিও গিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, "আটটা বাজতেই রোলিং শাটার নামিয়েছি আমি নিজে। তারপরেই শোকেস থেকে হিরেগুলো তুলে ভল্টে রাখবার জন্য যেই ঘুরেছি, অমনই ভাঙল কাচ।"

বড়বাবু বলেছিলেন, "কত টাকার হিরে গেল?"

"আন্দাজি হিসেবে এক কোটি টাকার তো হবেই। ঝামেলা হবে হিরের বকলসটা নিয়ে।"

"হিরের বকলস!"

"আজ্ঞে। কুকুর পোষার শখ ছিল ময়নাগড়ের মহারাজার। সেরা কুকুরকে হিরের বকলস পরিয়ে রাখতেন। রাজত্ব গেছে—তাঁর ছেলে ঠাটবাট বজায় রাখবার জন্য বকলসটা এনেছিল বেচবার জন্যে। আমি বলেছিলাম, রেখে যান। বিক্রি হলে দাম পাবেন, আমাকে কমিশন দেবেন। ছোকরা তো এখন আমাকে ছাড়বে না। যেভাবেই পারেন, হিরে উদ্ধার করে দিন।"

মাথা চুলকে বড়বাবু বলেছিলেন, "কিন্তু অত হিরে গেল কোথায়?"

"নিশ্চয় হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি," পরের দিন সকালে ইন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় বসে বললেন খোদ মালিক, যাঁর নামের মধ্যেও রয়েছে জহরতের গন্ধ।

নাম তাঁর জহর দাশ। দিব্যি পেটাই চেহারা। লম্বায় ছ' ফুট তো বটেই! গায়ের রং আর ফেসকাটিং সাহেবদের মতো। খালি যা মাথাজোড়া বিশাল টাক।

যে-বাঙালি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, ইন্দ্রনাথ তাকে একটু বেশি খাতির করে। জহর দাশের হিরের বোতাম, অর্গান্ডির পাঞ্জাবি আর চুনোট করা কোঁচার দিকে তাকিয়ে তাই বলেছিল, "ফাইন! আপনার রুচি আছে।"

"তা আছে। অনেক কিছুর। দেখতে যদি চান, বাড়ি আসুন। আপনার সেই লেখক বন্ধুকেও নিয়ে আসুন। কিন্তু ভাই, বকলসটাকেও উদ্ধার করে দিন। পুলিশ দিয়ে হবে না। অত হিরে কি ভ্যানিশ্‌ড হয়ে গেল? হোপলেস! সামান্য এই রহস্যের সমাধান করতে পারছে না! তাই দৌড়ে এলাম। প্লিজ হেল্প।"

হিরে চুরির কাহিনী শুনে ইন্দ্রনাথ নিজেও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল। কিন্তু জহর দাশকে তো আর তা বলা যায় না।

তাই বলেছিল, "ভাবতে সময় দিন।"

"তা হলে চলুন, আমার বাড়িতে চলুন, মাথা সাফ হয়ে যাবে।"

ইন্দ্রনাথ আমাকে বালিগঞ্জ থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল জহর দাশের পেল্লায় গাড়িতেই। তিনি থাকেন আহিরিটোলার একটা বিরাট বাড়িতে। রাজবাড়ি বললেই চলে।

বৈঠকখানায় বসে আগে নিজের কাহিনী

(এর পরে ৩৬ পাতায়)

টিনটিন * হার্জে

শেষ কথাটা শুনে রাখুন। রসিকতার চেষ্টা করবেন না। কী নাম আপনার ?
বলুন... বলে ফেলুন !
ধরা যাক, উনি সত্যি কথাই বলছেন। অ্যামনেসিয়ায় ভুগছেন, অর্থাৎ স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছেন ?
এর সঙ্গে এনিমিয়ার সম্পর্ক কী ?
অ্যামনেসিয়া ! মাথায় চোট লাগায় হয়তো ওঁর স্মৃতি হারিয়ে গেছে। এরকম হয়। আমি যদি আপনি হতাম, তা হলে ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাতাম..
তুমি কী বলো ?
দেখা যাক...
ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করি না ...
অদ্ভুত ? মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না ...
যা'ই হোক, জানলায় নতুন কাচ লাগাব ...
হ্যালো, বিল্ডারের অফিস ? জানলার একটা কাচ বদলে দেবেন ? হ্যাঁ ... টিনটিন ... রাত্রে আসবেন ? বাঃ ! ...
ও আপনি ! আসুন।
ধন্যবাদ
এই যে ...
শুভরাত্রি মিঃ টিনটিন। সাহায্য করলে খুশি হই ! ...
খুশি ! আশা করি বহুদিন আর দরকার হবে না ...
!?
ঝন-ঝনাত

ওটোকারের রাজদণ্ড

কপিরাইট . কাস্টারম্যান এস. এ.

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

(৩৩ পাতার পর)

ফলাও করে বললেন জহর দাশ। হিরে কেনাবেচা সূত্রে পৃথিবীভ্রমণ তাঁর কাছে টালা থেকে টালিগঞ্জ যাওয়ার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই তো সেদিন ঘুরে এলেন সাউথ আমেরিকা। ভেনেজুয়েলার এক কিউরেটরের কাছ থেকে কিনলেন একটা রক্তমুখী নীলা।

"রক্তমুখী নীলা!" মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলাম আমি, "সে তো সর্বনেশে নীলা।"

"আজ্ঞে," টাকে হাত বুলোতে-বুলোতে অবজ্ঞার সুরে বললেন জহর দাশ, খুবই সর্বনেশে। যা শুনে কিনলাম, তা যদি সত্যি হয়, তা হলে সাঙ্ঘাতিক সর্বনেশে।"

"কী শুনে কিনলেন?"

"আজটেকদের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?"

"শুনব না কেন?" আহত কণ্ঠে বলেছিলাম, "স্প্যানিয়ার্ডদের হামলার আগে মেক্সিকোয় যারা সবচেয়ে প্রবল জাত ছিল।"

"রাগ করলেন?"

"না, করিনি।"

"তা হলে শুনুন। আজটেকদের বিশ্বাস ছিল, সূর্য নাকি রোজ রাতে মরে যায়— নররক্ত না পেলে পরের দিন সকালে ওঠে না। তাই বছরে ১৫,০০০ নরবলি দিত রক্তলোলুপ সূর্যদেবতাকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য। বেশিরভাগ যুদ্ধবন্দি। আমি এই মন্দিরগুলোর কী নাম দিয়েছি জানেন? রক্তমন্দির। কী বুঝলেন?"

"রক্তমন্দিরে রোজ নরবলি হত।"

"রাইট। একটা মন্দিরের সূর্যদেবতার রক্তের তেষ্টা ছিল নাকি সবচেয়ে বেশি। যতক্ষণ না তেষ্টা মিটত, ততক্ষণ জ্বলজ্বল করত না একটা রক্তমুখী নীলা। তেষ্টা মিটলেই দপদপ করে দুবার ভেতরে জ্বলে উঠত লালরশ্মি। তেষ্টা পাওয়ার আগে জ্বলত একবার।"

"অদ্ভুত গল্প! কেউ দেখেছে?"

"হা হা! আমিও দেখিনি, তবে কিউরেটর যখন বলল, সেই মন্দিরের রক্তলোভী নীলা তার দখলে এসেছে, তখন কিনেই ফেললাম।"

"সঙ্গে নিয়ে এলেন? কাস্টমস্ কিছু বলল না?" ভেতরের রাগ কথার মধ্যে গোপন রাখতে পারিনি। ভদ্রলোক ভয়ানক সবজান্তা।

আর একদফা অট্টহেসে জহর দাশ সামনের নিচু টেবিল থেকে মস্ত একটা টোবাকো পাইপ তুলে নিয়ে বলললেন, "এর মধ্যে ছিল রক্তমুখী নীলা। জানতেই পারেনি।"

পাইপ-ভক্ত ইন্দ্রনাথ হাত বাড়িয়ে বলল, "দিন তো দেখি! কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন?"

"এই তো এইখানে," বলেই, পাইপের যে-ফোকরে তামাক ঠাসা হয়, সেটা পেঁচিয়ে খুলে ফেললেন জহর দাশ। খুলে এল কিন্তু আধখানা, বাকি আধখানায় রয়েছে ছোট্ট একটা গর্ত, আধ ইঞ্চির মতো ব্যাস। বললেন মুচকি হেসে, "দামি পাথর আনতেই হয়, কী আর করি বলুন, রক্তমুখী নীলা এসেছিল এর ভেতরে।"

"এখন তিনি কোথায়?"

"রক্তমুখী নীলা? দেখতে সাধ হচ্ছে? চলুন। আমার রুচির কথা বলছিলাম না? এইটাই সেই রুচি, চলুন।"

দেখেছিলাম আশ্চর্য মৎস্যাধার। মোটা কাচের বিশাল চৌবাচ্চা। তার মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে বড়-বড় রঙিন মাছ। তাদের অনেকের চোখের পাতা উঠছে আর নামছে। চোখ জ্বলছে ওপর থেকে ফোকাস-করা সারি-সারি আলোয়।

"কী বুঝলেন?" জহর দাশের এই এক সবজান্তা উক্তি। হাড় জ্বলে যায়। চুপ করে রইলাম।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিল বলল— "কলের মাছ আনিয়েছেন জাপান থেকে?"

"এই না হলে সার ইন্দ্রনাথ!" চোখ নাচালেন জহর দাশ। নিজেও যেন একটু নেচে নিলেন, "ধরলেন কী করে?"

"মাছেরা কি চোখ পিটপিট করে? করে না! রিমোট কন্ট্রোলার নিশ্চয় আপনার পকেটেই আছে। হাতটা কাইন্ডলি বের করবেন?"

"হা হা হা! ঠিক ধরেছেন। লেখক বন্ধু কিন্তু ধরতে পারেননি," বলতে-বলতে পাঞ্জাবির পকেট থেকে হাত বের করে রিমোট কন্ট্রোলারটা দেখালেন জহর দাশ।

"শাবাশ!" ইন্দ্রনাথের কথা যেন এখন নেচে নেচে ছুটছে, "এবারের ধাঁধা: জ্যান্ত মাছেদের ভিড়ে কলের মাছ কেন? আপনার এক নম্বর পরীক্ষায় যখন পাশ করেছি, দু' নম্বর পরীক্ষার রেজাল্টও বলে দিচ্ছি: কলের মাছেদের চোখে মণি বসিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কেন?"

"সরেস ব্রেন আপনার। ঠিক জায়গায় ঘা মেরেছেন। খুব দামি রত্ন খুব বেশি লুকিয়ে রাখতে নেই, রাখতে হয় চোখের সামনে, তাই আনিয়েছি কলের মাছ।"

"রক্তমুখী নীলা কার চোখে?"

"আয়... আয়... আয়!" বলতে বলতে রিমোট টিপে গেলেন জহর দাশ। লেজ নেড়ে নেড়ে কাচের ওদিকে এসে গেল প্রায় আধহাত লম্বা একটা রামধনু-রঙিন মাছ—ওর একটা চোখে পীত পোখরাজ, আর একটা চোখে রক্তমুখী নীলা। —যাঃ! লেজের ঝাপটা মেরে দূরে ছিটকে গেল কলের মাছ।

আমার দিকে তাকিয়ে বিচ্ছিরি হাসলেন

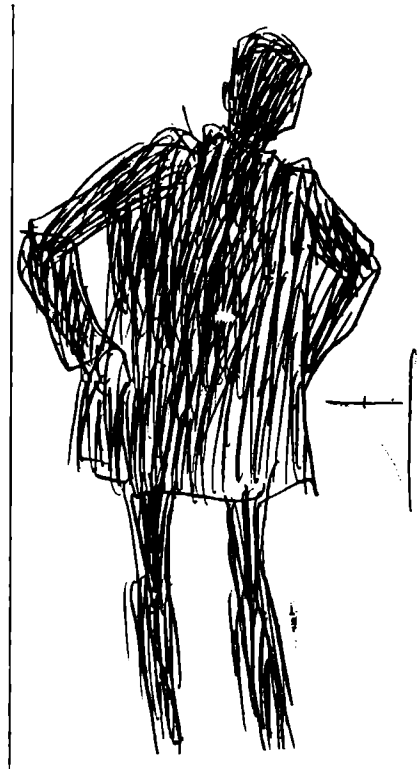

জহরত ব্যবসায়ী, "লেখক বন্ধুকে আমার আর একটা রুচির কথা বলে রাখি। — শুনছেন?"

"হ্যাঁ, শুনছি," বলতেই হল আমাকে।

"আমিও লেখক।"

"তাই নাকি!"

"তবে আপনার মতো লেখা ছাপিয়ে বেড়াই না জমিয়ে রাখছি, সেরা লেখাটা যে ছাই এখনও লেখা হল না, কোথায় বসে লিখব জানেন? জেলখানায়।..."

"জেলখানায় বসে লিখবেন?"

"আজ্ঞে। 'ডন কুইক্সোট' লেখা হয়েছিল জেলখানায়। সার ওয়াল্টার রলে, ভলতেয়ার, ও হেনরি, বার্ট্রান্ড রাসেল— এঁরা সকলেই ভাল-ভাল লেখাগুলো কোথায় বসে লিখেছিলেন? জেলখানায়। হিটলার তাঁর আত্মজীবনী 'আমার সংগ্রাম'-এর প্রথম পর্ব কোথায় বসে ডিকটেট করেছিলেন? জেলখানায়, জওহরলাল নেহরুও উত্তম গ্রন্থ রচনা করেছেন জেলখানায়। হা হা! আমিও চাই আমার সেরা লেখা জেলখানায় বসে লিখতে।"

সারা মুখে উপহাসের হাসি ছড়িয়ে কথা শেষ করলেন জহর দাশ। এখনও তিনি হাত বুলোচ্ছেন রিমোট কন্ট্রোলারে। বাইরে গম্ভীর গলায় ডেকে উঠল একটা কুকুর। একবার... দু'বার... তিনবার। তারপর সব চুপ।

চৌবাচ্চার দিক থেকে এতক্ষণ চোখ সরায়নি

ইন্দ্রনাথ। এখন আচমকা বলল, "সত্যিই জেলখানায় যেতে চান ?"

"সত্যি ! মাথায় ব্যামো আছে ভাবছেন ?...

"তা একটু আছে। নইলে নিজের হিরে এইভাবে কেউ লোপাট করে ?"

চোখ নাচালেন জহর দাশ, "তাই নাকি ? কীভাবে করলাম, সার ইন্দ্রনাথ ?"

"রোলিং শাটার নামানোর ঠিক আগে হিরের বকলস সমেত আরও হিরে নিজেই সরিয়ে নিয়েছিলেন।"

"বটে ! বটে !"

"রোলিং শাটার যখন নামানো হয়েছে, তখন শোকেসের বেশিরভাগ হিরেই ছিল আপনার পকেটে। হিরেচোর শুধু কাচ ভেঙেছে, হাত গলিয়েছে, তারপর ছুটেছে। সে আপনার লোক। তাকে হিরে নিতে কেউ দেখেনি, আপনিই নাকি দেখেছেন। জহর দাশ, চোর আপনি নিজে —হিরের বকলসের মালিককে বোকা বানাতে চেয়েছেন— তাই নিজের হিরেও কিছু সরিয়েছেন— হয়তো রেখেছেন কলের মাছেদের চোখের সকেটে, জেলখানায় যাওয়ার সাধ কি আছে এখনও ?"

সে কী হাসি জহর দাশের, "কক্ষনো না। সেরা লেখা মাথায় থাকুক। ওটা একটা সূত্র, দেখছিলাম, আপনার মগজ কতটা ধারালো। ইয়েস সার ইন্দ্রনাথ, সমস্ত হিরে রয়েছে কলের মাছেদের চোখে. আপনার চোখের সামনেই। হা হা হা !"

"রক্তমুখী নীলা দেখাতে ডেকে এনেছিলাম তো একই মতলবে— আমার সঙ্গেও চোর-পুলিশ খেলবার জন্য। ফলে জানলাম, কুকর্মে ঝোঁক রয়েছে আপনার। অভিনব পন্থায় হিরে চুরিই বা করবেন না কেন ?"

"খেলছিলাম তো বটেই, এ বড় মজার খেলা ! এ-যুগের বড়লোকি খেলা। আমার পূর্বপুরুষরা যদি বেড়ালের বিয়ে দিয়ে টাকা উড়িয়ে মজা করতে পারে, আমি আমারই হিরে চুরি করে মজা করতে পারি না ? আলবাত পারি।"

"নিজের হিরে নিয়ে করতে পারেন, পরের হিরে নিয়ে নয়।"

"হিরের বকলস ? আপনিও পারেননি বের করতে, পারলেই ফেরত পাবেন।"

"কুকুর ডাকছে কোথায় ?"

ফের চোখ নাচালেন জহর দাশ। নিজেও যেন নাচলেন— "দেখবার সাধ হয়েছে ? আসুন ! আসুন ! এই তো পাশের ঘরে।"

মৎস্যাধার কক্ষ থেকে বেরনোর আগে চৌবাচ্চার সেই নকল মাছটার দিকে ফিরে চেয়ে ছিলাম। আবার লেজ নাড়ছিল এদিককার কাঁচের গায়ে। রক্তমুখী নীলা চোখ ফেরানো ছিল আমার দিকেই। মনে হল যেন, দপ করে লাল রশ্মি ঠিকরে এল নীলার ভেতর থেকে। চোখের ভুল নিশ্চয়। ভয়ের চোটে কিন্তু হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার !

পাশের ঘরের এককোণে দেখলাম বিশাল কুকুরটাকে। ছোট বাছুরের সাইজ। লকলক করছে জিভ। টপটপ করে ঝরছে লালা। ধক ধক করছে দুই চোখ।

পাগলা কুকুর নাকি ? সভয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম চৌকাঠে। গলায় যখন শেকল নেই, ও-কুকরের কাছে আমি যাচ্ছি না।

চমৎকৃত চোখে চেয়ে ছিল ইন্দ্রনাথ। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে হাত বুলিয়ে নিল কুকুরটার গলার চামড়ার বকলসে। বলল, "চামড়ার পাটির নীচেই রয়েছে হিরের বকলস।"

ঠিক এই সময় বিকট হাঁক পাড়ল বিরাট কুকর। চার দেওয়াল যেন চৌচির হয়ে গেল সেই ডাকে। বিরক্ত গলায় বলল ইন্দ্রনাথ, "কী মজা হচ্ছে ? হাত সরান রিমোট থেকে।"

অপরাধী মুখে যন্ত্রটা পকেটে রেখে দু' হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন জহর দাশ, "ব্রেন বটে আপনার ! খেলে আরাম আছে আপনার সঙ্গে। কলের কুকুরকেও ধরে ফেললেন ?"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল ইন্দ্রনাথ, "এর জন্য ব্রেনের দরকার হয় না, চোর মহারাজ। কলের ডাইনোসর যখন তৈরি হচ্ছে, কুকুর কেন হবে না ?"

"হো হো হো ! হা হা হা ! খুব রগুড়ে লোক মশাই আপনি, ইয়ে, সার ইন্দ্রনাথ।"

"বাকি রগড় দেখাবেন জেলখানায়, সেরা লেখাটিও লিখবেন।"

"পাগল ! পুলিশকে জানিয়ে দেবেন, সব হিরে পাওয়া গেছে। কীভাবে ? সে-একটা গল্প এই লেখক বন্ধু লিখে দেবেন' খন। আংটিগুলো ? এই তো আমার ট্যাঁকে। আবার আসবেন। আরও বুদ্ধির খেলা আমি জানি। হা হা হা ! হো হো হো ! হি হি হি !"

শক্ত গলায় ইন্দ্রনাথ বলল, "জহর দাশ, রক্তমুখী নীলা বিদেয় করুন।"

"কেন, সার ইন্দ্রনাথ ?"

"অভিশপ্ত পাথর আপনার মাথা খারাপ করে দিয়েছে।"

জহর দাশ দাঁত খিঁচোলেন এবং পকেটে হাত পুরলেন। কুকুরটা ডেকে উঠল এবং খচমচ করে তেড়ে এল, দুই চোখ দিয়ে ঠিকরে এল লেসার স্পার্ক।

আমরা পালিয়ে এলাম।

ছবি : দেবাশিস দেব

অরণ্যদেব লি ফক

অরণ্য ওলিম্পিক্স... মেয়েরা বেশ জোরে দৌড়ল, দর্শকরাও খুশি
দৌড়ও মেয়েরা, জোরে, আরও জোরে
ওয়াম্বা, ওরা কি আমাদের চেয়েও জোরে দৌড়য় ?
মোটেই না ।
জোরে দৌড়য় ? আমি পেছন করে হাঁটলেও ওদের হারিয়ে দেব ।
আমি যখন খুশি তোমাদের হারিয়ে দিতে পারি, জানো ?

সবচেয়ে বড ইভেন্ট আগুনের ওপর দিয়ে পোল ভল্ট... শুরু করলেন অরণ্যদেব...
অরণ্য-দেব !

অরণ্য-দেব !
গনগনে আগুনের ওপর দিয়ে লাফ...
অরণ্য-দেব !

এবার পুরুষদের পালা... আগুনের ওপর দিয়ে পোল ভল্ট । জলের ওপর দিয়ে মেয়েদের ঝাঁপ...
হা-হা-হা !
ঝপাং

আগুনের খেলাগুলো খেলতে তোমার ভাল লাগে ? কী সাঙ্ঘাতিক সব খেলা ?
আমি ওদের খেলাগুলো শিখিয়েছি । এখন ওরা আশা করে আমিই ওদের নেতৃত্ব দেব । তা ছাড়া আমার ভালও লাগে ওগুলো ।
10/10

ওয়াম্বো... পোলভল্ট জিতেছ লোহানা... জিতেছ স্প্রিন্ট
অরণ্যদেবের শুভ চিহ্ন
আমরা টাকা করব কখন ? এত কিছু হয়ে গেল, অথচ...
ওই ওয়াম্বো, দেখছি সব ইভেন্টই জিতছে
এখনই শুরু করুন... বাজি ধরুন ওয়াম্বোকে নিয়ে ।

অরণ্যদেব লি ফক

স্প্রিন্টে ওয়াম্বোকে নিয়ে ছোটখাটো বাজি ধরুন। ওয়াম্বোই জিতবে... তবে...
গোচা, মোরো। তারপর বড় দৌড়ের জন্য বড় বাজি।

স্প্রিন্ট জিতল ওয়াম্বো!
আমাকে টাকা দাও...
আমাকে দাও
টাকা দাও...
...তুমি জিতেছ...তুমি জিতেছ...
তুমি জিতেছ!

অরণ্য ওলিম্পিক্স : অস্ত্রশস্ত্র পুরুষদের জন্য, মেয়েদের জন্য তীর-ধনুক।

ও!
গভীর খাদের ওপর লাঠালাঠি।

কেন এত বিপজ্জনক খেলা!
জঙ্গলে পুরুষরা বিপদের মধ্যে বাঁচতে ভালবাসে। সাধারণ খেলাধুলো ওদের ভাল লাগে না
10-17

এবার সবচেয়ে বিপজ্জনক ইভেন্ট। বড় দৌড়...জঙ্গলের মধ্যে ১০ মাইল দৌড়...হাতে শুধু একটা বর্শা। জঙ্গলে আছে সিংহ, চিতাবাঘ, বুনো শূকর...

বড় দৌড়ে যারা অংশ নেবে তাদের এখানে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি!
এবারই প্রচুর টাকা লুটে নেব। সব বাজি ওয়াম্বোর বিরুদ্ধে!
ওয়াম্বো, সব বাজি? গতবার সে জিতেছিল।
হ্যাঁ, এবারও যদি সে জেতে? তা হলে কী হবে?
জেতার জন্যই যাবে। কিন্তু পারবে না!
(ক্রমশ)

ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস

ভারত সরকারের পরিবেশ, বন, প্রাণী সংরক্ষণ ইত্যাদি মন্ত্রকে উচ্চ প্রশাসনিক পদে নিয়োগের জন্য ইউ. পি. এস. সি. পরিচালনা করে ফরেস্ট সার্ভিস এগজামিনেশন। সর্বভারতীয় এই পরীক্ষার নিয়মকানুন নিয়ে এবারের আলোচনা।

নয়াদিল্লির ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকারের ফরেস্ট সার্ভিসে প্রশাসনিক পদে নিয়োগের জন্য সর্বভারতীয় স্তরে পরিচালনা করেন এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। 'ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস এগজামিনেশন'। এই পরীক্ষা নেওয়া হয় ভারতের বেশিরভাগ বড়-বড় শহরে। যেমন, আগরতলা, আহমেদাবাদ, আইজল, ইলাহাবাদ, বাঙ্গালোর, বেরিলি, ভোপাল, বোম্বাই, কলকাতা, চণ্ডীগড়, কোচিন, কটক, দিল্লি, ধারওয়াড়, দিশপুর (গুয়াহাটি), গ্যাংটক, হায়দরাবাদ, ইম্ফল, ইটানগর, জয়পুর, জম্মু, যোরহাট, কোহিমা, লখনউ, মাদ্রাজ, মাদুরাই, নাগপুর, পানাজি, পটনা, পোর্টব্লেয়ার, রায়পুর, সম্বলপুর, শিলং, সিমলা, শ্রীনগর, তিরুপতি, ত্রিবান্দ্রাম, উদয়পুর ও বিশাখাপত্তনম।

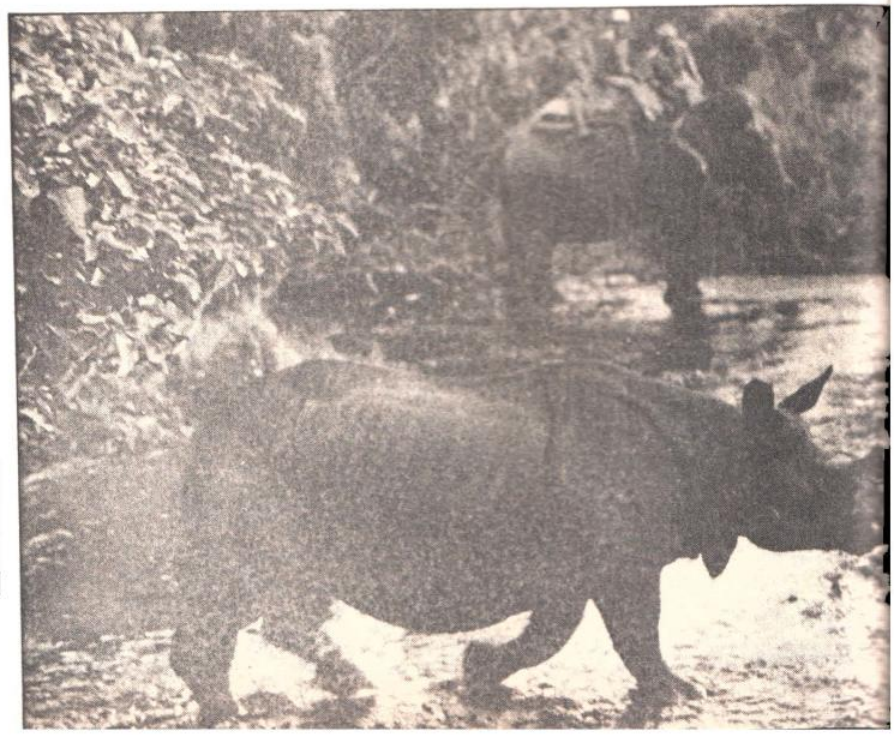

শিক্ষাগত যোগ্যতা

এই পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীকে স্নাতক হতে হবে এবং স্নাতক পর্যায়ে অবশ্যই যে-কোনও একটি বিষয়, যেমন, বটানি, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, স্ট্যাটিসটিক্স, জুলজি থাকা চাই। এ ছাড়া এগ্রিকালচার, ফরেস্ট্রি কিংবা এঞ্জিনিয়ারিং বিষয় নিয়ে যাঁরা স্নাতক হয়েছেন তাঁরাও পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। মনে রাখা দরকার, কোনও প্রার্থীই চারবারের বেশি পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। তবে তফসিলি জাতি, উপজাতি প্রার্থীদের এবং ও. বি. সি. প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা থাকবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে প্রার্থীর বয়সও বিচার্য বিষয়। প্রতি বছর ১ জুলাই তারিখের হিসেবে প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। তবে তফসিলি জাতি, উপজাতি প্রার্থীদের বয়সের ক্ষেত্রে আইনানুগ ছাড় আছে।

পরীক্ষার ফি

পরীক্ষা দেওয়ার আবেদনপত্রের সঙ্গে ফি হিসেবে ৬০ টাকার সেন্ট্রাল রিক্রুটমেন্ট ফি স্ট্যাম্প, পোস্টাল অর্ডার কিংবা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট জমা দিতে হবে। ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টে ফি জমা দিতে হলে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি শাখার ওপর ড্রাফ্ট কাটতে হবে। আর পোস্টাল অর্ডারে জমা দিতে হলে নয়াদিল্লির জেনারেল পোস্ট অফিসের ওপর প্রদেয় হওয়া চাই পোস্টাল অর্ডার।

পরীক্ষার বিষয়

পরীক্ষা নেওয়া হয় দুটি পর্যায়ে। লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা অর্থাৎ পার্সোনালিটি টেস্ট।

ফোটো : অশোক মজুমদার

লিখিত পরীক্ষার মধ্যে আবার দুটি ভাগ আছে। আবশ্যিক পেপার দুটি। যেমন, জেনারেল ইংলিশ (কোড-২১) ও জেনারেল নলেজ (কোড-২২)। প্রতিটি পেপারে ১৫০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া হয়। দুটি আবশ্যিক পেপার ছাড়া আরও দুটি ঐচ্ছিক বিষয়ে (প্রতিটি ২০০ নম্বরের) মোট ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। ঐচ্ছিক বিষয় বেছে নেওয়া যেতে পারে বিভিন্ন বিষয় থেকে। যেমন, এগ্রিকালচার (কোড ০১), বটানি (০২), কেমিস্ট্রি (০৩), সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং (০৪), জিওলজি (০৫), এগ্রিকালচারাল এঞ্জিনিয়ারিং (০৬), কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং (০৭), ম্যাথমেটিক্স (০৯), মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং (১০), ফিজিক্স (১১), জুলজি (১৩), স্ট্যাটিসটিক্স (১৪), ফরেস্ট্রি (১৫)। প্রতিটি বিষয়েই পূর্ণমান ২০০। তবে মনে রাখতে হবে কয়েকটি বিষয়ের কম্বিনেশন গ্রাহ্য হবে না, অর্থাৎ একই সঙ্গে দুটি বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। যেমন— এগ্রিকালচার (০১) ও এগ্রিকালচারাল এঞ্জিনিয়ারিং (০৬), কেমিস্ট্রি (০৩) ও কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং (০৭) ; ম্যাথমেটিক্স (০৯) ও স্ট্যাটিসটিক্স (১৪)।

প্রশ্নের ধরন

মনে রাখতে হবে, প্রতিটি বিষয়েই প্রশ্ন করা হয় গতানুগতিক ধরনের অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মতো 'এসে' টাইপের। প্রতিটি প্রশ্নপত্র শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষাতেই হবে এবং উত্তরও কেবলমাত্র ইংরেজিতেই লিখতে হবে। প্রতিটি পেপারের পরীক্ষার সময়সীমা তিন ঘণ্টা। কমিশন প্রতিটি পেপারে ন্যূনতম নম্বর ঠিক করে দিতে পারেন। উত্তর লিখতে হবে যুক্তি দিয়ে অল্প জায়গার মধ্যে এবং পরিচ্ছন্নভাবে। অস্পষ্ট মতামতের জন্য কোনও নম্বর দেওয়া হবে না। 'এসে' টাইপ উত্তর লেখার জন্য ব্যাটারিচালিত পকেট ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে। তবে পরীক্ষার হলে তা বিভিন্ন প্রার্থীদের মধ্যে বিনিময় করা চলবে না।

(এর পরে ৪৪ পাতায়) ৪১

ডাঃ রেক্স মর্গান
ডেভ ম্যানিংকে কেমন যেন একগুঁয়ে মনে হয় ।
ওঁর ধারণা, পড়শির কাছ থেকেই ওঁর মেয়ের টিবি ধরেছে ।
এই কথাটা ডেভ যেন কাউকে না বলে বসেন ।
এমিলির যদি টিবি হয়েই থাকে, তা হলে কোত্থেকে ওর রোগটা এল, তা কি আপনি নিজে খুঁজে দেখবেন ?
হ্যাঁ, আজ সকালে অ্যাণ্ডি রিড দায়িত্বটা আমাকে দিয়েছেন । ওঁর নিজের লোকদের কাজটা করতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে ।
তার মানে, আপনি কয়েক সপ্তাহ অফিসে আসবেন না । অফিসের দায়িত্বে থাকবে ক্যাথি !
জুন, তুমি বলেছিলে, তাই আমি ওর সঙ্গে বার্নার বিষয়ে কথা বলেছি । আমার মনের কথাটা ও জানে ।
এ ছাড়া আর কিছুই তো করার নেই ।... সময়....
ইতিমধ্যে
টিউবারকুলোসিস ? তুমি নিশ্চয় ভুল শুনেছ...
ডোরিস, আমি কানে ভাল শুনতে পাই । ডেভ বলেছেন, ডার্কের কাছ থেকে ওঁর মেয়ের টিবি ধরেছে ।
9-25
হয়তো এইজন্যই ডার্ক সবসময় কাশে ।
তা হলে ডার্কের কাছ থেকে রোগটা তো আমাদেরও ধরতে পারে !

ডাঃ রেক মর্গান

ইতিমধ্যে

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

(৪১ পাতার পর)

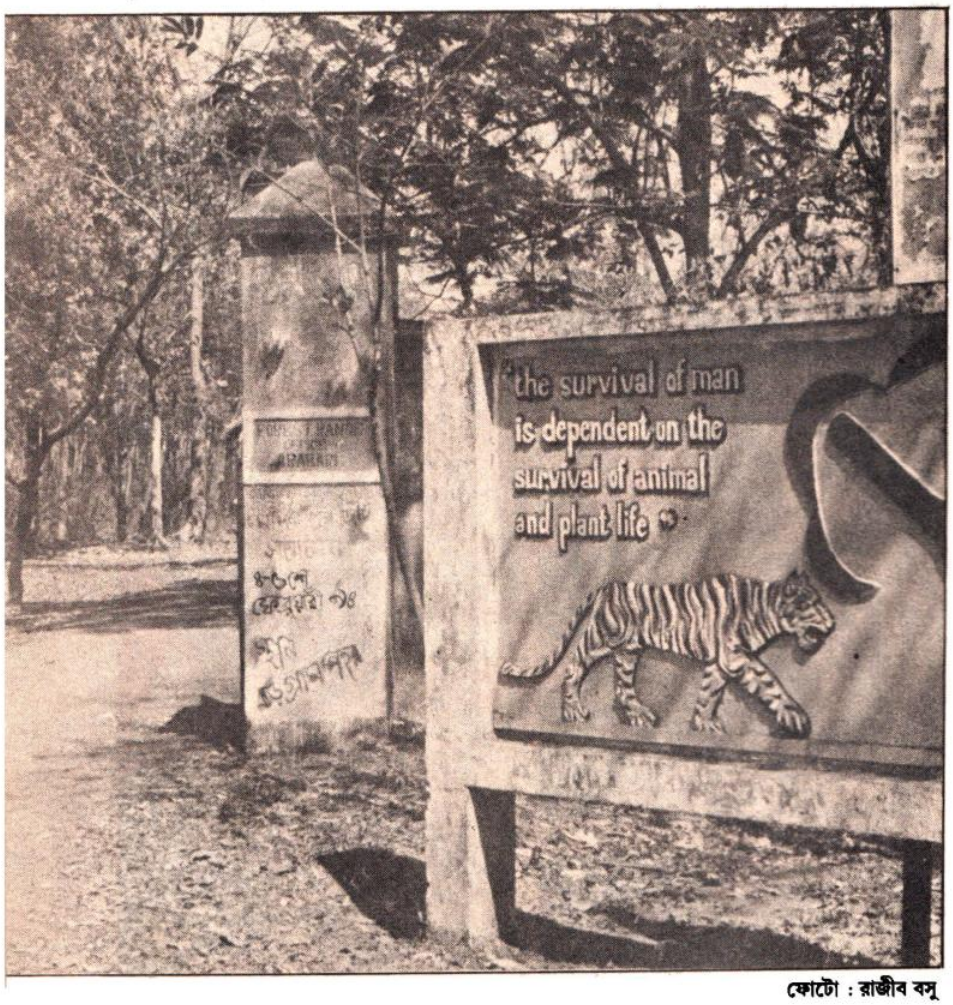

ফোটো : রাজীব বসু

পরীক্ষার সিলেবাস

আবশ্যিক জেনারেল ইংলিশ পেপারে ইংরেজিতে 'এসে' লিখতে দেওয়া হয়। আর অন্যান্য প্রশ্ন করা হয় এমনভাবে, যাতে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের ক্ষমতা ইত্যাদি যাচাই করে দেখতে পারেন। এ ছাড়া 'প্যাসেজ' থেকে 'সামারি' অথবা 'প্রেসি' লিখতে দেওয়া হয়। ইংরেজি সংবাদপত্র পড়া দরকার এবং নিয়মিত বিভিন্ন কম্পিটিটিভ জার্নাল পড়ার অভ্যাস থাকা দরকার। ইংলিশ গ্রামার ও কম্পোজিশনের বই থেকেও নিয়মিত অনুশীলন করলে শব্দের যথার্থ ব্যবহার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠবে এবং সাবলীলভাবে শুদ্ধ ইংরেজি লেখার ক্ষমতা বাড়বে।

আবশ্যিক জেনারেল নলেজ (কোড-২২) পেপারের সিলেবাসের মধ্যে বর্তমান ঘটনা এবং সেসব বিষয়ের দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ, বিজ্ঞানের ব্যবহার ও ব্যাখ্যা সম্পর্কিত যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন ইত্যাদি আছে। এ ছাড়া ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ভারতের সংবিধান, ভারতের ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়েও প্রশ্ন করা হয়।

বিভিন্ন ঐচ্ছিক বিষয়ের সিলেবাস প্রসঙ্গে জানাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের ওই বিষয়ের সিলেবাসই মোটামুটিভাবে এক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হয়েছে। তবে যাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স নিয়ে পাশ করেছেন কিংবা এই বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স পড়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে একটু বাড়তি সুবিধে হবে নিশ্চয়ই। কেননা, এমন সব প্রশ্ন করা হয় এবং তার যথার্থ উত্তর লিখতে হলে ওই বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা থাকা দরকার, আর এজন্যই ওই বিষয়ে অনার্স কিংবা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের সুবিধে হয়। তবে অন্যান্য পরীক্ষার্থীও পুরনো প্রশ্নপত্রের ধরনধারণ সম্পর্কে জেনে প্রস্তুতি নিলে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

আবেদনের নিয়ম

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে শূন্যপদ জানার পর প্রতি বছর বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্রে পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। বিস্তারিত তথ্য, নিয়মকানুন জানানো হয় ভারত সরকারের প্রকাশিত 'এমপ্লয়মেন্ট নিউজ গেজেট'-এ। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে হাতে লিখে কিংবা টাইপ করে আবেদন জানাতে হয়। যোগাযোগের ঠিকানা : সেক্রেটারি, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ঢোলপুর হাউস, নয়া দিল্লি- ১১০০১১। আবেদনের সঙ্গে পাঠাতে হয় পরীক্ষার ফি সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট কিংবা পোস্টাল অর্ডার, অ্যাটেনডেন্স শিট, দু' কপি সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজের ফোটোগ্রাফ, নাম-ঠিকানা লেখা অতিরিক্ত ৪৫ পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত একটি পোস্টকার্ড, দুটি ডাকটিকিট ছাড়া ১১.৫×২৭.৫ সেন্টিমিটার মাপের নাম-ঠিকানা লেখা বড় খাম ইত্যাদি। সুবিধের জন্য আবেদনপত্র এভাবে সাজানো যেতে পারে, যেমন, প্রথমে মূল দরখাস্ত, নীচে অ্যাটেনডেন্স শিট, তারপর পোস্টাল অর্ডার কিংবা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট, তার নীচে পোস্টকার্ড এবং সবশেষে নাম-ঠিকানা লেখা, সাদা দুটি খাম।

দরকারি কথা

আবেদনের সময় কিছু কোড নম্বর ব্যবহার করতে হয়। বিষয়ের কোড আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এবার পরীক্ষা-কেন্দ্রের কিছু কোড নং উল্লেখ করছি। যেমন, ইলাহাবাদ (০২), ভোপাল (০৪), কলকাতা (০৬), কটক (০৭), দিল্লি (০৮), দিশপুর (০৯), পটনা (১৫), শিলং (১৬), লখনউ (২৬), পোর্টব্লেয়ার (৩৭), গ্যাংটক (৪২), আগরতলা (৪৫), সম্বলপুর (৫৩) ইত্যাদি। এ ছাড়া কমিউনিটি কোড এস সি-র ক্ষেত্রে (১), এস টি-র ক্ষেত্রে (২),ও বি সি ক্ষেত্রে (৩), জেনারেল ক্যাটিগরির ক্ষেত্রে (৪)।

ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস এগজামিনেশন : একনজরে

বয়ঃসীমা : ২১ থেকে ২৮ বছর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বটানি, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, স্ট্যাটিসটিক্স, জুলজি, এগ্রিকালচার, ফরেস্ট্রি, এঞ্জিনিয়ারিং—যে-কোনও বিষয়সহ স্নাতক।

সময়-সীমা : চারবার। তফসিলি জাতি, উপজাতির ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ নেই। ও বি সি-র ক্ষেত্রে সাতবার।

পরীক্ষার ফি : ৬০ টাকা। তফসিলি জাতি/উপজাতির ক্ষেত্রে কোনও ফি নেই।

অমর দাশ

শিশুদের মনোজগৎ

বই পড়ার ব্যাপারে যাতে আগ্রহ ও অভ্যাস গড়ে ওঠে সেজন্য সত্য ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত সংঘাতময় রচনা।

পড়তে-পড়তেই পরের ঘটনা ও কাহিনীর জন্য ঔৎসুক্য জাগায় বলে শিশুদের কাছে তা বর্ণময় ও আবেদনশীল। স্টেপিং স্টোন সিরিজের এইরকম দুটি বই হল, 'হ্যানা' ও 'সকার ম্যানিয়া'।

বইগুলি সাত থেকে ন' বছর বয়সের শিশুদের মনের মতো করে লেখা।

গ্লোরিয়া হোয়েল্যান-এর লেখা ও লেসলি বোম্যান-এর সাদা-কালো ছবি দিয়ে ভরানো এই সংবেদনশীল বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে, এবং তা

সাহিত্য-সমালোচকরা রীতিমত প্রশংসাও করেন। ন' বছরের একটি অন্ধ মেয়ের ঘটনা, মেয়েটির নাম হ্যানা। ঘটনার সময়কাল ১৮৮৭ সাল। স্কুলে যাওয়া ও সপ্তাহে একবার করে চার্চে যেতে দেওয়া ছাড়া হ্যানাকে আর কিছুই করতে দেওয়া হত না। তারপর একজন শিক্ষিকার সাহচর্য পেয়ে কীভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে হ্যানা আস্তে-আস্তে আত্মবিশ্বাস লাভ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠল, এই বিষয়ের ওপর সত্যিকারের এক মর্মস্পর্শী কাহিনী, যা ছোটদের পড়তে খুবই ভাল লাগবে। আর দাম মাত্র সাত ডলার।

শিশুমনের স্বাভাবিক, সহজাত গুণকে জোর করে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আটক রেখে আমরা বড়রা হয়তো সেই গুণকে অঙ্কুরে নষ্ট করে ফেলি। পেটে ও তার বন্ধুরা খুব ভাল ফুটবল খেলত। তাই দেখে তাদের অভিভাবকরা ওদের দিয়ে একটা সরকারি দল তৈরির কথা ভাবলেন, যদিও এই চিন্তাটা খুব ভাল, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল এইসব অতি উৎসাহী অভিভাবকদের উৎসাহ যত বাড়তে লাগল ততই শিশুদের মন থেকে খেলার আনন্দ চলে যেতে লাগল। বেশি চাপ যে ছোটদের বিষয়ে বিমুখ করে তোলে, তারই পটভূমিতে লেখা গল্প 'সকার ম্যানিয়া'। বইটি লিখেছেন এরিকা ট্যামাচ এবং ছবি এঁকেছেন ডি ডে রোসা। দাম মাত্র সাত ডলার।

পথ চলতে

রোমাঞ্চকর অভিযান সম্পর্কে ছোটদের উৎসাহী করে তুলতে বইটি বিশেষ সাহায্য করবে। ভাসমান ডায়াল কম্পাস, জলনিরোধক একটি ম্যাপ সংবলিত বইটি যথার্থভাবে ছোটদের নির্দেশ দেবে, সে তার শহরে ও শহরের বাইরে কীভাবে নিজেই পথঘাট খুঁজে নিয়ে চলবে। ভাল লাগে মার্ক স্মিথ ও ক্রিস্টিন কেনেডির লেখা 'পাথ ফাইন্ডার্স অ্যাডভেঞ্চার কিট'।

কাজল চক্রবর্তী

রইল ওঁদের দু'টি বই

জাগো জাগো কবি
অনির্বাণ সিন্‌হা
পরিবেশক : আনন্দ
পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-৯
দাম : ১০ টাকা

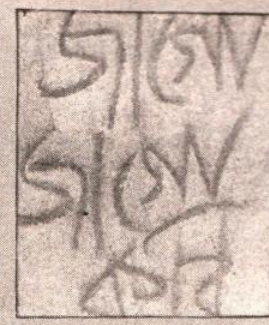

দেবারতি
দেবারতি রায়
প্রকাশক : নৃপেন্দ্র চন্দ্র রায় ও শিপ্রা রায়
মহাত্মা গান্ধী রোড, রামপ্রসাদ নগর, নিমতা, কলকাতা-৪৯
দাম : ৪৫ টাকা

সেন্ট যোসেফ স্কুলে পড়ত অনির্বাণ। পড়াশোনার ফাঁকে সে গান গাইত, গান লিখত, সেই গানে সুর দিত, কবিতা লিখত। বলা যায়, কাব্যের এক আলাদা জগৎ ছিল তার মধ্যে, আর ছিল সুরের এক আশ্চর্য ভুবন। কবিত্ব ছিল তার সহজাত কিন্তু গভীর ব্যঞ্জনাময়। সে লিখেছে 'আলো আঁধার' কবিতায়—"প্রভু, তোমার আলোয় আঁধার আছে / আঁধারে নেই আলো, / তুমি ঝড়ের রাতে নেভাও প্রদীপ / পূর্ণিমাতে জ্বালো।" আর একটি কবিতা 'জন্মদিন'। সেই কবিতায় সে লিখেছে—"সঙ্গে এল কেক, সন্দেশ, কতই উপহার, / আমি আনি সঙ্গে করে একটি নমস্কার।" কবিতার মতোই তার লেখা প্রবন্ধ এবং গান—সমান সাহিত্যগুণান্বিত। তার বয়স তখন মাত্র ১৮, মৃত্যু ক্যানসারের ছদ্মবেশে এসে তাকে নিয়ে চলে গেল এক অনির্বাণ লোকে। ছড়িয়ে রইল তার কিছু সুর আর কবিতার অনির্বাণ চিহ্ন এই 'জাগো জাগো কবি' বইটিতে।

এরকমই আর এক নবীন প্রতিভা দেবারতি রায়। সেও মাত্র ১৭ বছর ছিল এই অপরূপ পৃথিবীতে। পড়ত শুকচরের সেন্ট জেভিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে দ্বাদশ শ্রেণীতে। এক অদ্ভুত জ্বর তাকে কেড়ে নিয়ে গেল পৃথিবী থেকে। সেও কী সুন্দর কবিতা লিখত, গল্প লিখত। উপন্যাসও লিখেছিল। বাংলা এবং ইংরেজিতে চলত তার সাহিত্যচর্চা। তার কবিতায় তাই "আমি রাত জেগেছি অন্ধকারের গভীরতা জানব বলে" অথবা "রাত জেগেছি প্রতিবাদ করতে শিখব বলে"—এরকম বলিষ্ঠ লাইন খুঁজে পাই। এই বই 'দেবারতি'তে আমরা পাই দেবারতির সাহিত্য-প্রাণটিকে। এই বইটিতে ছড়িয়ে আছে তার নীরব সাহিত্য সাধনার মণি-মুক্তো।

বর্ণপ্রিয় বসু

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

অ্যাসটেরিক্স ও সোনার কাস্তে

গল্প : গোচিনি
ছবি : ইউদেরজো

(এর পরে ৫১ পাতায়)

বন্যপ্রাণী শিকারেও দক্ষ এইসব কুকুর

জাপানি কুকুরের কদর বাড়ছে বিদেশে

পৃথিবীর নানা দেশে এখন জাপানের কুকুরের প্রবল চাহিদা।

লিখেছেন **আশিস সরকার**

জাপানের কুকুর প্রভুভক্ত সাধারণ কোনও প্রাণী নয়, পবিত্র জীব হিসেবে এখানে তাকে রীতিমত সম্ভ্রম দেখানো হয়। প্রাচীনকাল থেকেই জাপানে কুকুর বিশেষ মর্যাদা পেয়ে আসছে। মনে করা হত, এই প্রাণীটির মধ্যে আলাদা ক্ষমতা আছে—'সেই ক্ষমতা'র সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ। জাপানের বিভিন্ন লোকগাথা ও গল্পে প্রভুভক্ত এই প্রাণীটি সম্পর্কে অনেক আশ্চর্য সব কথা আছে! পুরাতাত্ত্বিকরা জাপানের বিভিন্ন জায়গায় মাটি খোঁড়াখুঁড়ির পর এমন অনেক নির্দশন পেয়েছেন, যাতে প্রমাণ হয় যে, পুরাকালেও জাপানের সমাজে কুকুরের একটা বড় ভূমিকা ছিল। শিকার ছাড়াও যুদ্ধের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের ব্যবহার করা হত এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে। খুব ধুমধামের সঙ্গে দেওয়া হত মৃত কুকুরের সমাধি। কানাগাওয়াতে কুকুরের সমাধিতে পাওয়া গেছে তামার ঘন্টার এমন একটা অংশ, যেখানে খোদাই করা আছে কুকুরের বন্যশূকর শিকারের দৃশ্য। জাপানি কুকুদের নাম তাই তারা যে প্রাণী শিকারে বেশি দক্ষ, সেই অনুযায়ীই দেওয়া হয়েছে। যেমন, শিশি-ইনু বা শূকর-শিকারি, শিকা-ইনু বা হরিণ-শিকারি, কুমা-ইনু বা ভালুক-শিকারি ইত্যাদি। অনেক সময় অবশ্য দ্বীপের নাম অনুযায়ী কুকুরের নাম রাখা হয়েছে, যেমন কিশু কিংবা শিকোকু। আকার ও আকৃতি অনুযায়ী তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে জাপানি কুকুরদের। বড়মাপের পুরুষ কুকুররা লম্বায় হয় ৬৭ সেন্টিমিটার লম্বা এবং স্ত্রী-কুকুর ৬১ সেন্টিমিটার। মাঝারি পুরুষ কুকুর ৫২ সেন্টিমিটার এবং স্ত্রী-কুকুর ৩৭ সেন্টিমিটার। বড়মাপের কুকুরদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরাপ্রজাতি হল আকিতা,ঘন কালো আর বাদামি লোমের সঙ্গে ঘিয়ে রঙের লোমে ঢাকা এই কুকুর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে, আর শিকারি কুকুর হিসেবেও নাম কিনেছে। এদের আদি বাস বরফে ঢাকা উত্তর জাপানের টোজো কু অঞ্চলে, সেখান থেকে এরা সারা জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। মাঝারি আর ছোট মাপের কুকুরদেরই জাপানে লাগানো হয়েছে শিকারের কাজে। শিশি-ইনু, কুমা-ইনু—এরা সবই মাঝারি মাপের কুকুর। আইনু বা হোক্কাইডো আর কাই নামে কুকুরগুলো আবার মাঝারি আর ছোট মাপের মাঝামাঝি। এ ছাড়া চিনা, জাপানি স্পিৎজ, জাপানি টেরিয়ার আর টোসা জাপানি কুকুরদের মধ্যে বেশ নামী।

গত কয়েক বছরে কুকুরদের জনপ্রিয়তা জাপানে দারুণ বেড়ে গেছে, শুধু তাই নয় আমেরিকা, জার্মানি বা তাইওয়ানেও জাপানি কুকুরদের চাহিদা এবং কদর বেড়েছে। আমেরিকান কেনেল ক্লাব জাপানি কুকুরদের বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে, 'শিবা' নামের কুকুর জাপানে সবচেয়ে জনপ্রিয়। আমেরিকাতেও এদের নামে গড়ে উঠেছে 'শিবা ক্লাব'।

কুকুরদের প্রভুভক্তি এবং আনুগত্য অসাধারণ। প্রখর দৃষ্টি আর প্রচণ্ড ক্ষিপ্র এই কুকুরগুলো দারুণ পোষ মানে।

১৯৭৯ সালে জাপান কেনেল ক্লাব আন্তর্জাতিক কুকুরপ্রেমী সংস্থা এফ .সি .আই, বা ফেডারেশন অব সাইনোলোজিক ইন্টারন্যাশানালে যোগ দেয়।

এই কুকুরের নামে বিদেশে গড়ে উঠেছে ক্লাব

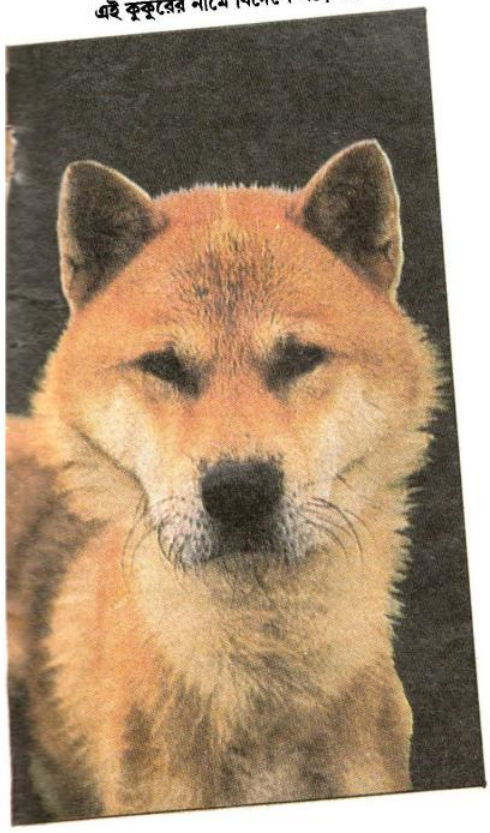

You are a

Kwality
ICE CREAM

ys on my mind.

ALWAYS THE ONE
Kwality
ICE CREAM
THE ONLY ONE

HTA.3576.95

Cups. Cones. Bars. Bricks. In all the flavours you love.

প্রাইম-এর অভূতপূর্ব জয়

পেশ হল সেরা মানের এমন কম্পাস বক্স যা চুলচেরা সূক্ষ্মতা, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং আরও বেশি দক্ষতা আনার জন্যে বিশেষভাবে ডিজাইন করা।
আপনার খুদে প্রতিভার হাতে তুলে দিন প্রাইম-এর মস্ত সুযোগ। দেখবেন, সব কিছু ছাপিয়ে ওটিই হয়ে উঠেছে ওর সারাক্ষণের সঙ্গী।

প্রাইম মেরিট | **প্রাইম র‍্যাঙ্ক** | **প্রাইম জিনিয়াস** | **প্রাইম লীডার**

◀ ম্যাথেমেটিক্যাল ড্রইং ইনস্ট্রুমেন্ট্স ▶

PIDILITE PRODUCTS

PID 63 95 BEN

(৪৬ পাতার পর)

অ্যাসটেরিক্স ও সোনার কাস্তে

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

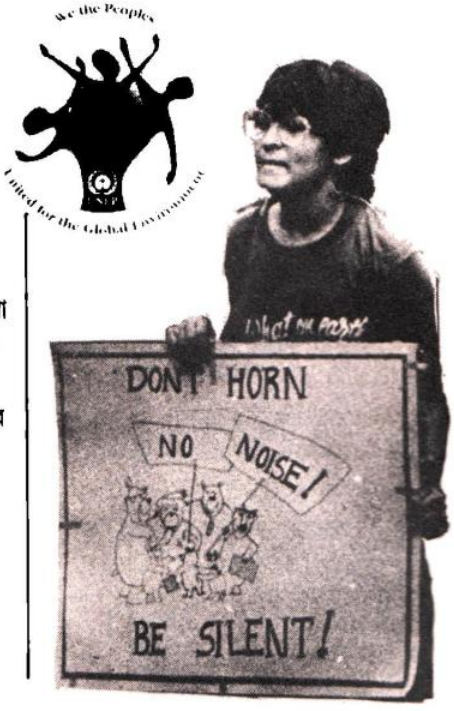

রবীন্দ্রনাথের গল্পের মৃত্যুঞ্জয় পেরেছিল, আমরা পারব না কেন

রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় অমূল্য সোনার পরিবর্তে চেয়েছিল আলো, আকাশ, বাতাস। সেই আর্তি আজ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষেরই। লিখেছেন রতনতনু ঘাটী

পাটলয়াদ-এর এক ছোট্ট জেলা ঝাবুয়া। সেই জেলারই প্রকৃতি-নিবিড় জামালি গ্রামে গত আট জুন প্রচন্ড গরমে এবং জলের অভাবে মারা গেছে আটটি ময়ূর। গ্রীষ্মের অসহ্য গরম এবং পানীয় জলের অভাবে শুধু মানুষেরই দুর্গতির শেষ নেই তা নয়, বিপন্ন হয়ে উঠেছে বন্যপ্রাণীর জীবনও। অথচ এবারের বর্ষায় আটটি ময়ূরই পেখম মেলতে পারত।

একদিকে 'গ্রিন হাউস এফেক্ট'-এর ফলে বেড়ে উঠেছে পৃথিবীর তাপমাত্রা, অন্যদিকে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ওজোন স্তরের পরদা প্রতিনিয়ত পাতলা করে চলেছে। তাই সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি এসে আছড়ে পড়ছে পৃথিবীর বুকে। এর সঙ্গে আছে 'অ্যাসিড বৃষ্টি', আছে মানুষের তৈরি অবর্জনা, শিল্প সংস্থার বর্জ্য পদার্থের পাহাড়। তার ফলে প্রতিনিয়ত দূষিত হয়ে উঠছে পৃথিবীর জল, মাটি, বাতাস।

মানুষেরই তীব্র হঠকারিতায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে বন, দূষিত হয়ে উঠছে নদীর জল, হারিয়ে যাচ্ছে কত বন্যপ্রাণী। এর ফলে প্রকৃতি হারিয়ে ফেলছে তার ভারসাম্য, মানুষ হারিয়ে ফেলছে এই সুন্দর পৃথিবীতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ।

১৯৭২ সালের পাঁচ জুন প্রথম পালিত হয়েছিল সারা পৃথিবী জুড়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। সেদিন মানুষ প্রথম সম্মিলিতভাবে পৃথিবীতে শুরু করেছিল পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন। সেই থেকে প্রতি বছরই পাঁচ জুন পালিত হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এবারও পালিত হয়েছে। বাস্তবিক, ১৯৮৭ সাল থেকে প্রতি বছর পাঁচ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হয়ে উঠেছে এক বর্ণাঢ্য বার্ষিক উৎসবের মতো।

ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউ. এন. ই. পি.) সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু করেছে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন। অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে নিয়ে তারা নানারকম পরিকল্পনা করছে। প্রতিবারের মতো তারা এবারেও বেছে নিয়েছিল একটি দেশকে। এবারে 'হোস্ট' দেশ নির্বাচন করা হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকাকে। এরা আজ প্রায় ২০ বছর ধরে বিভিন্ন দেশকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দিয়ে, সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলেছে পরিবেশ রক্ষার 'কবচ'।

জলসম্পদকে দূষণের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা, এবং সেই জলসম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য ইউ. এন. ই. পি. ১৯৯৩-'৯৪ সালে ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। তারই কাজ এগিয়ে চলেছে তরতরিয়ে। ন'টি নদী ও হ্রদ নিয়ে তাদের এই পরিকল্পনায় কাজ চলছে আরল সাগর, জামবেজি নদী ও চাদ হ্রদে। অন্য যে ছ'টি নিয়ে কাজ শুরু হবে-সেগুলি হল, মেকং নদী, সান-জুয়ান নদী, টিটিকাকা হ্রদ, কাস্পিয়ান সাগর এবং চিনের জিনজিয়াং ও আথহি অঞ্চল (পূর্ব এশিয়ান সমুদ্র উপকূলের)।

ভূমিসম্পদকেও কাজে লাগানোর কথা ভাবছে ইউ. এন. ই. পি.। সেক্ষেত্রে বেছে নিয়েছে আফ্রিকাকে। দক্ষিণ এবং পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ান দেশগুলির বিশাল অবহেলিত ভূমিসম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য গ্রহণ করেছে নানা পরিকল্পনা। পৃথিবীর মোট ভূমিসম্পদের ১৫ শতাংশ জমি এখানে কোনও কাজে লাগানো হয় না।

ইউ. এন. ই. পি'র এরকম অসংখ্য পরিকল্পনার পাশে পৃথিবীর বাস্তব চিত্র এবং ভারতের বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে দেখা দরকার। শুধু ঘটা করে পরিবেশ পালনই তো পরিবেশ রক্ষার শেষ কথা নয়। কতটা সচেতনতা তৈরি হয়েছে পৃথিবীবাসীর মধ্যে— তাও ভেবে দেখতে হবে। যদি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ পরিবেশ রক্ষার জন্য সচেতন হয়ে ওঠে তা হলেই হবে যথার্থ কাজ। আজ পানীয় জলের জন্য এত হাহাকার কেন ? সারা পৃথিবীতে তিনগুণ জলভাগ থাকা সত্বেও

মানুষ কেন তৃষ্ণার্ত যথার্থ পরিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ? ইতিমধ্যে আমেরিকার মতো সদা সচেতন দেশেরও ১৬ হাজার কিলোমিটার নদী, খাল ও হ্রদ দূষিত হয়ে পড়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে, সে-চিত্র আরও ভয়াবহ। পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদী ও দামোদর নদ দূষিত হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শুধু গঙ্গা নদীর তীরেই গড়ে উঠেছে ৩৭ টি শহর এবং ১৫০ টি শিল্পকারখানা। এইসব শহরের সব ময়লা, আবর্জনা এবং শিল্পসংস্থার বর্জ্য পদার্থ এসে পড়ছে পতিতপাবনী গঙ্গা নদীতে। আর দামোদর নদের তীরে দুর্গাপুর, আসানসোল এবং ধানবাদের মতো শিল্পশহর ছাড়াও গড়ে উঠেছে ৪৭ টি শিল্পকারখানা। এই ৪৭ টি কারখানার মধ্যে মাত্র দু'টির আছে বর্জ্য পদার্থ পরিশোধনের ব্যবস্থা। আর বাকি ৪৫ টি শিল্পকারখানার সব বর্জ্য পদার্থই এসে পড়ছে দামোদরে। ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেজ ইনস্টিটিউটের ১৯৮৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী মোট নিঃসৃত কার্বনের ১৮ শতাংশ সৃষ্টি করছে উন্নতশীল দেশগুলি। আকরিক লোহার উৎপাদন বেড়েছে গত ১০০ বছরে প্রায় ১০০ গুণ। খনিজ জ্বালানির উৎপাদন বেড়েছে ৭৫ গুণ এবং তামার ব্যবহার বেড়েছে ৬৫ গুণ। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আবর্জনার পরিমাণও।

ভাবলে অবাক হতে হয় ; কয়লা এবং ধাতু খনি থেকে তুলে নেওয়ার পর সারা পৃথিবীতে পড়ে আছে প্রায় ৯০ লক্ষ হেক্টর জমি ! এটা প্রায় একটা গোটা হাঙ্গারির মোট ভূমির সমান। পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতার কথা লিখলে, শেষ করা যাবে না। আমাদের ভারতের অন্যতম দ্রষ্টব্য শাহজাহানের তৈরি তাজমহলও আজ পরিবেশ দূষণের শিকার। তাজমহলের শ্বেতপাথরে শুরু হয়ে গেছে 'স্টোন ক্যানসার'। এইভাবে কলকাতার অন্যতম স্মৃতিসৌধ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালও পরিবেশ দূষণের হাত থেকে নিস্তার পায়নি। চারিদিকে পরমাণু যুদ্ধের হুঙ্কার, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, শিল্প কারখানার দূষণরোধহীন ব্যবস্থা ও অন্তহীন বর্জ্য পদার্থ, গাড়ি ও কলকারখানা থেকে নিঃসৃত কার্বন, সমস্ত কিছু নিয়ে আজ বিবেচনার সময় এসেছে। মানুষ ধীরে-ধীরে সচেতন হয়ে উঠছে। পরিবেশ নিয়ে সবাই আজ চিন্তিত। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার একটা খবর সবাইকে চমকে দিয়েছে। কোচবিহার জেলার আঁটিয়ামোচড় বনাঞ্চলে বাস করেন রাভা, ওঁরাও, এক্কা, খাড়িয়া, রাজবংশী আদিবাসীরা। আজ থেকে দশ বছর আগেও তাঁরা জীবিকানির্বাহ করতেন বনাঞ্চলের গাছ কেটে। আজ তাঁরা কুড়াল ফেলে হাতে তুলে নিয়েছেন তীর-ধনুক, লাঠি, কোদাল। এই বনবাসী মানুষই আজ বনরক্ষীর ভূমিকায়, কেউ গাছ কাটতে এলেই চিৎকার করে উঠছেন তাঁরা ; 'রুখ যাও'। আঁটিয়ামোচড়ের টাকুয়ামারি থেকে খাগড়িবাড়ি কিংবা চেংটিবাড়ি থেকে বড়শালবাড়ি—সব অরণ্যই আজ আগলে রেখেছেন বনবাসীরাই। এই বনবাসীদের মতোই পরিবেশ সচেতন হয়ে উঠতে হবে পৃথিবীবাসীকে। তবেই সম্ভব যথার্থ পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন।

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গুপ্তধন' গল্পের সেই ধারাগোল গ্রামের মৃত্যুঞ্জয়কে। অন্তহীন গুপ্তধনের লোভ যাকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আলোর পৃথিবী থেকে অন্ধকারের দিকে। মৃত্যুঞ্জয় গুপ্তধনের লোভে ছুটে গিয়েছিল আলো-বাতাসহীন এক মাটির নীচের সুড়ঙ্গে। সেখানে তাল-তাল সোনা। চোখ ধাঁধানো সোনার স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে যদি মৃত্যুঞ্জয় সেদিন বুঝতে পেরে থাকে—অন্ধকূপের মধ্যে সোনার আকর্ষণে তিলতিল করে জীবন শেষ করে দেওয়ার মধ্যে আনন্দ নেই, জীবনের জন্য চাই আলো, চাই আকাশ, চাই মুক্ত বাতাস—তা হলে আমরা বুঝব না কেন জীবনের এই একমাত্র সত্যকে ?

গ্রহের নাম অ্যালফ্লোলল

জে. সি. মেজিয়ারেস ও পি. ক্রিস্টিন

ওদের ঘিরে জঙ্গল আরও ঘন হয়ে উঠেছে, ঘন্টার পর ঘন্টা ওরা হাঁটছে...

গ্রহের নাম অ্যালফ্লেলিল

জে. সি. মেজিয়ারেস ও পি. ক্রিস্টিন

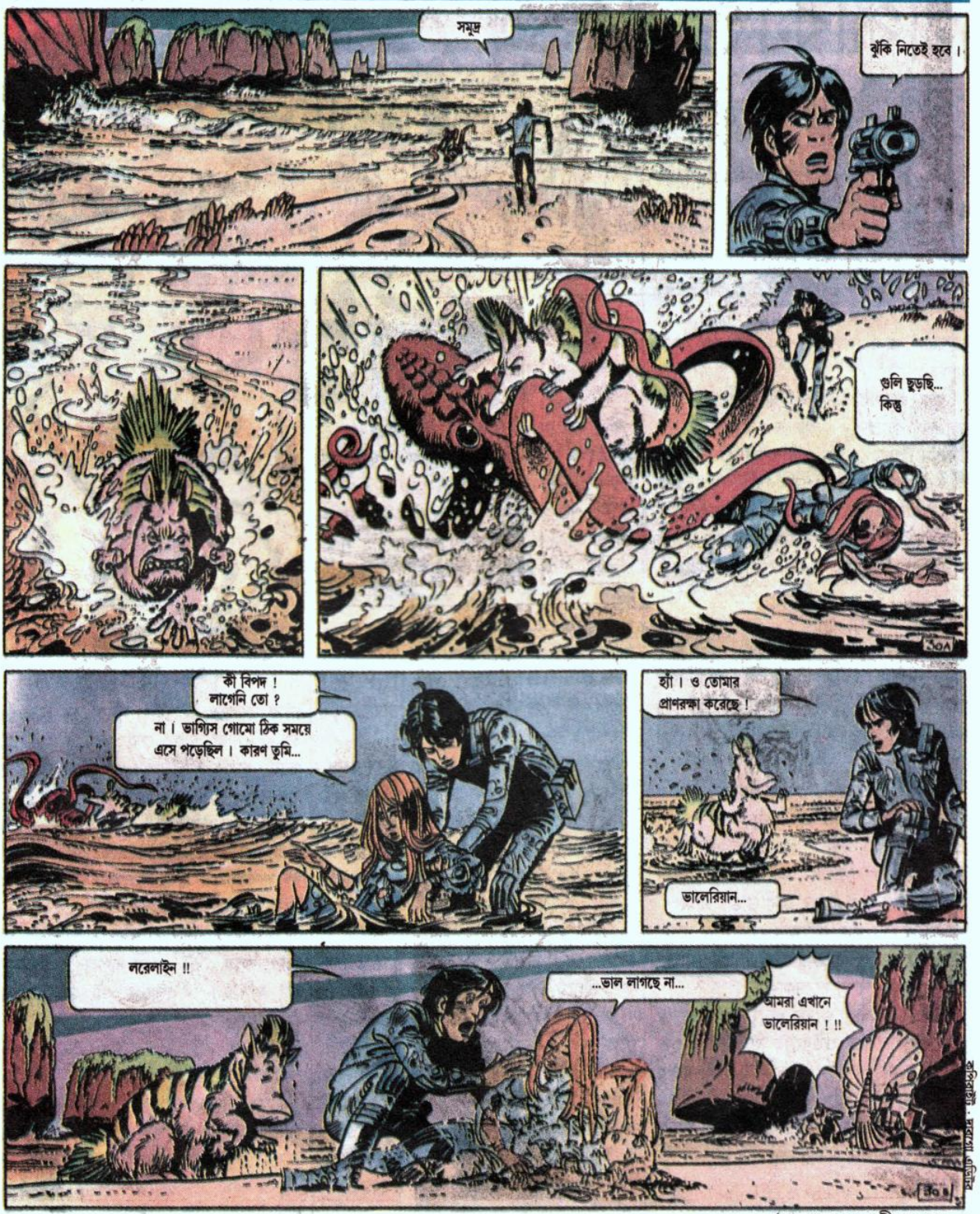

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গল্প

লঙ্কাকাণ্ড

রমেন দাস

প্রতি বছর পুজোর সময় অথবা আম-কাঁঠালের মরসুমে একবার অন্তত দেশের বাড়ি যেতাম। দেশ মানে শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়ি। শীতল-স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘেরা সবুজ সুন্দর পরিবেশ আর চড়ুই-শালিকদের মনমাতানো কূজন ; ফুড়ুত-ফুড়ুত নাচন। এ সময়টার জন্য সারাটা বছর অপেক্ষা করে থাকতাম।

বাবা আচমকা একদিন দেশে যাওয়ার দিন ঘোষণা করলেন। আনন্দে আমরা মেতে উঠলাম। তারপর টানা চব্বিশ ঘণ্টার জলযাত্রায় কীর্তনখোলা, মেঘনা, পদ্মা পাড়ি দিয়ে এক ভোরে জাহাজ থেকে নামলাম। নেমেই দেখি, তালতলার জাহাজঘাটে অনেক নৌকোর ভিড়ে সুরেনকাকু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সুরেনকাকু মানে আমাদের দেশের বাড়ির সর্বক্ষণের কাজের লোক। লেখাপড়া জানত না। কিম্ভূতকিমাকার হলেও সবসময় মুখে হাসি লেগে থাকত। পাঁচ গাঁয়ের খবরাখবর তার নখদর্পণে। বিশেষ করে স্বদেশী-করা মানুষের খবরাখবর। নেতাজি, গান্ধীজির নামে পাগল হত।

তালতলা জাহাজঘাট থেকে আমাদের গ্রামের বাড়ি নৌকোয় আরও প্রায় একবেলার পথ। প্রথমে ধলেশ্বরী নদী। খরস্রোতা এই নদীর উজান ভেঙে নৌকো চলছে। দু-তিনজন জওয়ান মাঝি 'গুণ' টানার জন্য ডাঙায় নামল। বড় মাঝি হাল ধরে নৌকোর পেছনে। বাবার সঙ্গে সামনের পাটাতনের ওপর বসে আমরা ভাইবোনেরা। পাশে সুরেনকাকু।

ধলেশ্বরীর ঘোলা জলের ছলাত-ছলাত শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শুশুকদের ডিগবাজি খাওয়া দেখতে আমরা মশগুল। মা-বাবাও আমাদের সঙ্গে কৌতূহলী চোখে শুশুক দেখছেন। কিন্তু সুরেনকাকুর গম্ভীর মুখে কোনও কথা সরছে না। বিশ্বের হাজার ভাবনা যেন তার মাথায় ভিড় করেছে।

ধলেশ্বরীর মূল স্রোত ছেড়ে আমাদের নৌকো বাঁয়ে বাঁক নিয়ে একটি খালে পড়ল। ডাঙা থেকে গুণ টানা মাঝিরা নৌকোয় উঠে এল। সুরেনকাকু এবার অনেকটা হালকা। খরস্রোতা ধলেশ্বরী ভালয়-ভালয় পাড়ি দিয়ে ছোট খালে নৌকো পড়তেই দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল। বলল, "পদ্মা নদীরই শাখা ধলেশ্বরী। সকাল বলে শান্ত নদী। কিন্তু এ নদীর তেজ তো তোমরা দ্যাখোনি ! কীর্তিনাশা পদ্মাকে চেনা যায়, কিন্তু ধলেশ্বরীকে চেনা দায় ! যখন-তখন বিপদ ঘটিয়ে ছাড়ে।"

বাবা সুরেনকাকুর কথা শুনে হেসে বলে উঠেছিলেন,"তাই কি এতক্ষণ তোমার মুখ ভাবগম্ভীর ছিল ?"

সুরেনকাকু একগাল হেসে বলল, "বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে জলযাত্রা। একটু চিন্তা হয় বইকী, দাদাবাবু !"

সুরেনকাকুর দরদী মনের আঁচ পেয়ে মায়ের মুখেও হাসি ফোটে। মা-ও তার কথায় সায় দেন।

পালে হাওয়া লাগায় এবার নৌকোর গতি বেড়ে গেল। সাঁতার কাটার ঢঙে নৌকো তরতর করে এগিয়ে চলল। দু' পাশের ধানখেত মাথা নুইয়ে যেন আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। আঙুল তুলে বাবা ধু-ধু-করা বহুদূরের একটি কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ দেখালেন। আমরা সাগ্রহে সেদিকে তাকাতে বাবা বললেন, "ওটাই আমাদের গ্রাম, নয়ানগর। আর মাত্র ঘণ্টাখানেকের পথ।"

মনে হল নীল আকাশটা যেন সবুজ মাঠের শেষ প্রান্তে গিয়ে আমাদের গ্রামেই নেমেছে। কৃষ্ণচূড়ার লাল রঙের ছোপ আকাশটাকে রঙিন করে তুলেছে। একদৃষ্টে দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সময় যেন আর শেষ হয় না ! নীরব, নিস্তব্ধ সেই মুহূর্তে আচমকা হাসি শুনে চমকে উঠলাম। দেখি, সুরেনকাকু উচ্চরোলে হাসছে। মুখে তার কোনও কথা নেই। হাসি আর হাসি। আমরা অবাক ! বাবাও অবাক চোখে তার দিকে তাকালেন। তা হলে কি সুরেনকাকুর মাথা বিগড়েছে ! বাবা ধমকের সুরে বললেন, "হচ্ছেটা কী ?"

সুরেনকাকু বাবার ধমক খেয়ে অতিকষ্টে হাসি চেপে বলল, "ওই দেখুন দাদাবাবু, রাজনগরের হাট বসেছে। খালপারের ওই হাট দেখলেই আমার হাসি পায়।"

বাবা এবার আরও বিরক্ত হন। বলেন, "কীসব বাজে বকছ সুরেন ?"

"হ্যাঁ দাদাবাবু, ঘটনাটা শুনলে আপনারও হাসি পাবে।" বলেই সুরেনকাকু মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলে চলে, "আপনাদের পাশের গ্রাম তেলিরবাগে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গ্রামে, গেল মাসে মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন। এ-তল্লাটের সব গ্রাম সেখানে ভেঙে পড়েছিল।

ঝিলের মাঠে হাজার-হাজার মানুষ। আমিও গিয়েছিলাম। দু' হাত জোড় করে নেংটি পরা মানুষটিকে সকলে নমস্কার জানাতে আমরাও নমস্কার করে জোরগলায় 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়েছিলাম।"

দেখলাম, বাবা মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাঁ-করে সুরেনকাকুর কথাগুলো শুনছেন। মাঝে-মাঝে শুধু বলেন, "তারপর ?"

বাবার আগ্রহ দেখে সুরেনকাকুর আবেগ যেন আরও উথ্‌লে ওঠে। বলে, "তারপর গান্ধীজি শান্তকণ্ঠে বললেন, আমাদের স্বদেশভূমি পরাধীন। তাকে স্বাধীন করার জন্য সকলকে দেশের কাজ করতে হবে। তাঁর কথা শুনে সভা আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর উৎসাহে মেতে উঠল। আবার বন্দেমাতরম ধ্বনি উঠল।

"গান্ধীজি এর পর বিদেশি পণ্য বর্জনের ডাক দিয়ে বললেন, নিজের কাপড় নিজে বুনবে, বিদেশি কাপড় পরবে না।

"আমরা আবার হাততালি দিয়ে বন্দেমাতরম ধ্বনি তুলতেই দেখি একদল লালমুখো গোরা সৈন্য বন্দুক-লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দশগ্রাম থেকে আসা নিরীহ মানুষগুলোকে অকথ্যভাবে লাঠিপেটা করতে লাগল। মুহূর্তে সভা ছত্রখান হল। মারের হাত থেকে আমরাও রেহাই পেলাম না।"

সুরেনকাকু চাপা ক্ষোভ প্রকাশের একটা সুযোগ পেয়েছে। তার মুখের বর্ণনা শুনে বাবার দু' চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। আমরা জানতে চাইলাম, "গোরা সৈন্য কী ?"

বাবা শান্তভাবে জানালেন, "তখনকার দিনে বিদেশি ইংরেজ শাসকরা বিলেত থেকে সাহেবদের এনে এ-দেশের পুলিশে-মিলিটারিতে চাকরি দিত। গায়ের রং গৌরবর্ণ বলে সাধারণ মানুষ ওদের গোরা সৈন্য বলত।"

সুরেনকাকুর দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আরও কিছু বলবার জন্য সে উসখুস করছে। আমাদের নৌকো ততক্ষণে রাজনগরের হাটের কাছাকাছি। বাবার দিকে তাকিয়ে সুরেনকাকু বলল, "সেই গোরা সৈন্যদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে কিন্তু খুব বেশি দেরি হয়নি।"

"প্রতিশোধ ?" বাবার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

"হ্যাঁ দাদাবাবু, পাঁচ গাঁয়ের মানুষ তারপর থেকেই প্রতিশোধ তোলার সুযোগ খুঁজছিল। হঠাৎ একদিন সে-সুযোগ এই রাজনগরের হাটেই এসে গেল।" বলেই সুরেনকাকুর আবার সেই উচ্চহাসি। হাসি যেন আর থামতে চায় না !

এবার আর বাবা বিরক্ত হলেন না। বললেন, "ব্যাপারটা খুলে বলো তো সুরেন ?"

সুরেন বলল, "দিন কয়েক আগে জনাপাঁচেক গোরা সৈন্য ঘুরতে-ঘুরতে রাজনগরের হাটে আসে। যাবি তো যা, ওরা গিয়ে হাজির হল অধীরকাকার সব্জির দোকানেই। অধীরকাকার সাজানো সব্জির ঝুড়িতে লাল টুকটুকে কিছু বোম্বাই লঙ্কা ছিল। দেখলেই মনে হবে লোভনীয় কোনও রসাল ফল। আকারেও অনেকটা বড়জাতের লিচুর মতো। দুষ্প্রাপ্য বীজ এনে অধীরকাকা তার ছোট্ট বাগিচায় ওই লঙ্কার চাষ করে বেশ নাম করেছে। যেমন রং, তেমনই কড়া ঝাল। অধীরকাকার রাগ ছিল গোরাদের ওপর। কারণ গান্ধীজির সভায় গিয়ে সেও লাঠিপেটা হয়েছিল।

"সব্জির ঝুড়িতে ওই লাল টুকটুকে লোভনীয় 'ফল' দেখে গোরা সৈন্যদের লোভ হল। ওদের ইংরেজি কথা অধীরকাকা বুঝতে পারেনি। তারপর আকার-ইঙ্গিতে সে ভাববিনিময় করে। এর পর হাসতে-হাসতে অধীরকাকা বলে, 'ভেরি সুইট, ভেরি গুড !'...."

গোরারা আর দেরি করে না। দশ টাকার একটা কড়কড়ে নোট ছুড়ে দিয়ে হুমড়ি খেয়ে বোম্বাই লঙ্কাগুলো তুলে নিল। তারপর আর দেরি নয়। বুভুক্ষুর মতো দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই তিন-চারটে করে লঙ্কা এক-একজন একসঙ্গে মুখে পুরে চিবোতে লাগল। মুহূর্তে ওরা রসাল ফল-এর স্বাদ টের পেল। ওদের বুকফাটা চিৎকারে হাটের লোকজন ছুটে এল। গোরা সৈন্যদের আর্ত চিৎকার আর দাপাদাপি দেখে হাটের লোকজনের সে কী হাসি ! একটি লোকও ওদের সাহায্যে এগিয়ে গেল না। নিরুপায় গোরারা ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিল রাজনগরের খালে। গলাজলে নেমেও স্বস্তি পেল না। চোখের জল আর নাকের জলে একশেষ হল। বীর গোরাদের সে কী দশা !" বলেই সুরেনকাকু আবার উচ্চরোলে হেসে উঠল। সুরেনকাকুর মুখে 'গোরা-কাহিনী' শুনে মা-বাবার সঙ্গে আমরাও হেসে খুন। হাসতে-হাসতে বাবা প্রশ্ন করলেন, "তুমি তখন কী করছিলে সুরেন ?"

নিমেষে সুরেনকাকুর মুখের হাসি উধাও। গম্ভীরভাবে সগর্বে বলল, "আমি মূর্খ মানুষ দাদাবাবু। লেখাপড়া শিখিনি। কিন্তু চারণকবি মুকুন্দ দাসের সেই বিখ্যাত গানটা আমার জানা ছিল। চড়া গলায় মনের আনন্দে আমি তখন সেই গানে সুর তুললাম —

ছিল ধান গোলা ভরা
শ্বেত ইঁদুরে করল সারা..."

ছবি : দেবাশিস দেব

টিনটিনের অমর স্রষ্টা হার্জের জো পাম্পের উত্তরাধিকার

ডানা পাখির উত্তরাধিকার

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গল্প

ঈশ্বর মালটোর পুঁথি

গৌরী সেন

এক-একজনের এমন এক-একটা অভ্যাস থাকে, যাকে কিছুতেই ছাড়তে পারে না। সূর্য যেই পশ্চিম দিকে ঢলেছে গৌতম সেন কিছুতেই বাড়িতে থাকতে পারেন না, দক্ষিণ দিকের পাহাড়-জঙ্গল যেন তাঁকে ডাকতে থাকে, কনকনে ঠাণ্ডায়, ঝলসে যাওয়া রোদে কিংবা টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যেও তাঁকে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

সেদিন কলেজের অন্য অধ্যাপকদের সঙ্গে গৌতম সেনও বসে ছিলেন। সাড়ে তিনটে বাজে, একটু পরেই ছুটি হয়ে যাবে, গৌতম সেন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে পাহাড়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। তাঁকে চেয়ার থেকে উঠতে দেখে অধ্যাপক অরুণ ঘোষ বললেন, "গৌতমবাবু, নিশ্চয়ই পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছেন! বসুন, বসুন।"

"হ্যাঁ, ভাবছি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বের হতে পারলে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াতে পারব।"

"আচ্ছা গৌতমবাবু, রোজ-রোজ ওই পাহাড়-জঙ্গলে কী দেখতে যান আপনি বলুন তো?"

"কী জানি, বিকেল হলেই ওই পাহাড়ে একটু না উঠলে সেদিনটা আমার কেমন যেন বৃথা মনে হয়।"

"নাঃ, আমার কিন্তু মনে হয় ওই পাহাড়ের আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে-মিশে আপনারও ওদের মতো নাচগানের নেশায় ধরেছে, তাই যেতেই হয়—" বলতে-বলতে হো-হো করে হেসে ওঠেন অরুণ ঘোষ।

অরুণ ঘোষের কথায় অন্যরাও হাসতে থাকেন।

"তা যা বলেছেন, নাচ আর গানটা ওঁদের জীবনের অঙ্গ, আদিবাসীদের নাচগান আমার খুবই ভাল লাগে। তবে কী জানেন, ওই পাহাড়-জঙ্গল সত্যিই আমাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া নিশ্চয়ই জানেন, রাজমহল পাহাড়টা খুবই প্রাচীন। এখানে বিচিত্র পাথর, গাছ, জন্তু-জানোয়ারের বহু ফসিল পাওয়া গেছে। এ-অঞ্চলের পাহাড়ে এক অতি প্রাচীন আদিবাসীরা থাকেন, যাঁদের বলা হয় পাহাড়িয়া, ওঁদের কথাও নিশ্চয়ই শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, খুব বেশি না হলেও, কিছু-কিছু শুনেছি। এঁরা সাঁওতাল নন, আর এও শুনেছি এঁদের

জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে।"

"ঠিকই শুনেছেন। তবে পাহাড়িয়ারা তিন ধরনের— কুমারবাগ পাহাড়িয়া, সাটরিয়া পাহাড়িয়া আর মাল পাহাড়িয়া। এঁদের মধ্যে মাল পাহাড়িয়ারা একটু স্বতন্ত্র ধরনের—"

গৌতম সেনের কথা শেষ হওয়ার আগেই ছুটির ঘন্টা বেজে ওঠে।

অধ্যাপকরা সকলে বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠে পড়েন।

এদিকে গৌতম সেন ভাবছেন, "আজ কলেজের শেষ ঘন্টায় আমার ক্লাস ছিল না, ভেবেছিলাম আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বের হয়ে পড়ব, কথায়-কথায় দেরি হয়ে গেল। অবশ্য কাল রবিবার। পাহাড় থেকে ফিরতে একটু রাত হয়ে গেলেও কিছু এসে-যাবে না। তা ছাড়া আজ পূর্ণিমা, চাঁদের আলোতে বাড়ি ফিরতেও কষ্ট হবে না। আজ না হয় দেরি করেই ফিরব।"

বাড়ি ফিরে এক কাপ চা খেয়েই বের হয়ে পড়েন গৌতম সেন। বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরেই পাহাড়, ঝরনার পাশ দিয়ে পাথরের ধাপে-ধাপে পা রেখে ওপরে উঠতে থাকেন। চারপাশে ঝোপঝাড়, জঙ্গল, কোথাও-কোথাও অবশ্য বড়-বড় গাছও আছে। পাহাড়ের ওপরে যত উঠছেন বড়-বড় গাছের ভিড় তত বাড়তে থাকে। ঝরনার একটানা ঠুংরি গান শুনতে শুনতে একসময় পাহাড়ের একদম ওপরে চলে আসেন, চারদিকে বড়-বড় শালগাছের ভিড়, এই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে থাকেন। আজ তাঁর ইচ্ছে ঝরনার উৎস-গুহার ওপরে প্রায় পাহাড়ের চুড়োর কাছে যে সমতল ভূমিটা আছে তার কাছে যাওয়া। "এখনও তো ভালই দিনের আলো আছে, কাছাকাছি পাহাড়িয়াদের গ্রামটাও ভাল করে ঘুরে দেখা যাবে।" এই গ্রামে কয়েকবার এসেছেন, গ্রামের লোকেদের সঙ্গে কিছু-কিছু জানাশোনাও আছে, তবে ভালভাবে মেশা হয়নি। তা ছাড়া এতদিন শুনে এসেছেন ঝরনার উৎস-গুহার ওপরে আরও একটি গুহা আছে। এতদিন তো দেখা হয়নি, আজ দিনের আলোতে গুহাটা নিশ্চয়ই ভাল করে দেখা যাবে।

ভাবতে-ভাবতে এগিয়ে চলেছেন। ঝরনার উৎস-গুহার কাছে এসে অবাক হয়ে যান, "আরে ওপরে ওঠার জন্য সুন্দর পায়ে চলার পথও রয়েছে দেখছি!" পায়ে চলার পথ ধরেই গৌতম সেন এগোতে থাকেন। একটু পরেই গানের আর মাদলের শব্দ শুনতে পান। একটু ঘুরেই দেখতে পান বেশ খানিকটা খোলা জায়গা, সামনেই পাহড়ের গায়ে একটা গুহার মুখ, ঝরনার উৎস-গুহার মুখের উলটোদিকে এই গুহার মুখটা। কিন্তু তাঁর আশ্চর্য লাগে, গুহার মুখটা একটা বিরাট পাথর দিয়ে বন্ধ।

গুহার মুখের সামনে খোলা জায়গাটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেখানে পাহাড়িয়া ছেলেমেয়েরা নাচগান করছে। একটা আনন্দের পরিবেশ।

গৌতম সেন ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে যেখানে বৃদ্ধরা বসে ছিলেন, তাঁদের পাশে গিয়ে বসলেন।

"আচ্ছা, আজ আপনাদের কোনও পুজো আছে বুঝি?"

দীর্ঘদিন এখানে থেকে মোটামুটি সাঁওতালি ভাষা তো জানেনই, পাহাড়িয়াদের সঙ্গে মিশে-মিশে ওঁদের ভাষাটাও মোটামুটি রপ্ত করে নিয়েছেন, তাই সাঁওতাল বা পাহাড়িয়া কারও সঙ্গে কথা বলতে ওঁর অসুবিধে হয় না।

গৌতম সেনের পাশেই যিনি বসে ছিলেন তিনি বললেন, "আজ আমাদের কানুডো গোঁসাইয়ের পুজো।"

"কানুডো গোঁসাইয়ের পুজো! তিনি কি গুহার ভেতরে থাকেন?"

"হ্যাঁ, ওই গুহার মধ্যে তিনি এখনও আছেন।"

"গুহার মুখটা বিরাট পাথর দিয়ে বন্ধ করে রেখেছ কেন? ওটা সরানো যায় না?"

ওটা সরাব কী করে, দুশো লোক মিলেও ওটা সরানো যাবে না। তা ছাড়া ওটা সরানো বারণ।"

"কেন, যদি সরানো হয়, তবে কী হবে?"

"আমাদের পূর্বপুরুষরা যাঁরা এখানে প্রথম এসেছিলেন তাঁদের একজন ইশ্‌র মালটো, তিনি ওই গুহায় থাকতেন, কানুডো গোঁসাইয়ের ভক্ত ছিলেন, শুনেছি সারারাত মশাল জ্বালিয়ে তিনি কী সব করতেন। কারও সেখানে যাওয়া বারণ ছিল। ওখানে তিনি আজও কানুডো গোঁসাইয়ের কাছে ঘুমিয়ে আছেন।"

গৌতম চুপ করে থাকেন। ওঁদের নাচগান আবার শুরু হয়। গৌতম ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, নানা চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তিনি বাড়ি ফেরার জন্য আগের পথ ধরেই হাঁটতে শুরু করেন। ইতিহাসের অধ্যাপক গৌতম স্বভাবতই নিজের কৌতূহলে অনেক খোঁজখবর নিয়ে জেনেছেন এই মাল পাহাড়িয়ারা এক সময় বাংলার পাহাড়-জঙ্গলে বাস করতেন, কিন্তু ক্রমাগত বাইরের আক্রমণে বিতাড়িত হয়ে এদিকের পাহাড়-জঙ্গলের দুর্ভেদ্য এলাকায় এসে আশ্রয় নেন। এঁরা আজও বিশ্বাস করেন তাঁদের দেবতা পাহাড়ের ওপর থাকেন, সমতলভূমিতে গেলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। তাই আজও এঁরা পাহাড়-জঙ্গলেই থাকেন কিন্তু এঁদের দেবতা কানুডো গোঁসাই, তিনি কে? গৌতম আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকেন। "ওহো, গোঁসাই শব্দটা তো বাংলা, আর কানুগো শব্দটা কানুডো হতেই পারে! এ-ধরনের রূপান্তর বাংলায় হয়েই থাকে। আবার যে লোকটি কানুগো গোঁসাইয়ের পুজো, করতেন, তাঁকে এঁরা বলে থাকে মালটো, নিশ্চয় তাঁর নাম ছিল ঈশ্বর মালটো। বেশ মজার ব্যাপার।

"ওই গুহায় ঢোকার আর কোনও অন্য পথ আছে কি না জানতে হবে। হাঁটতে-হাঁটতে গৌতম তখন ঝরনার উৎস-গুহাটার পাশে চলে এসেছেন, থমকে দাঁড়ালেন, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ওপরে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, ঝরনা-গুহার

(এর পরে ৬৪ পাতায়)

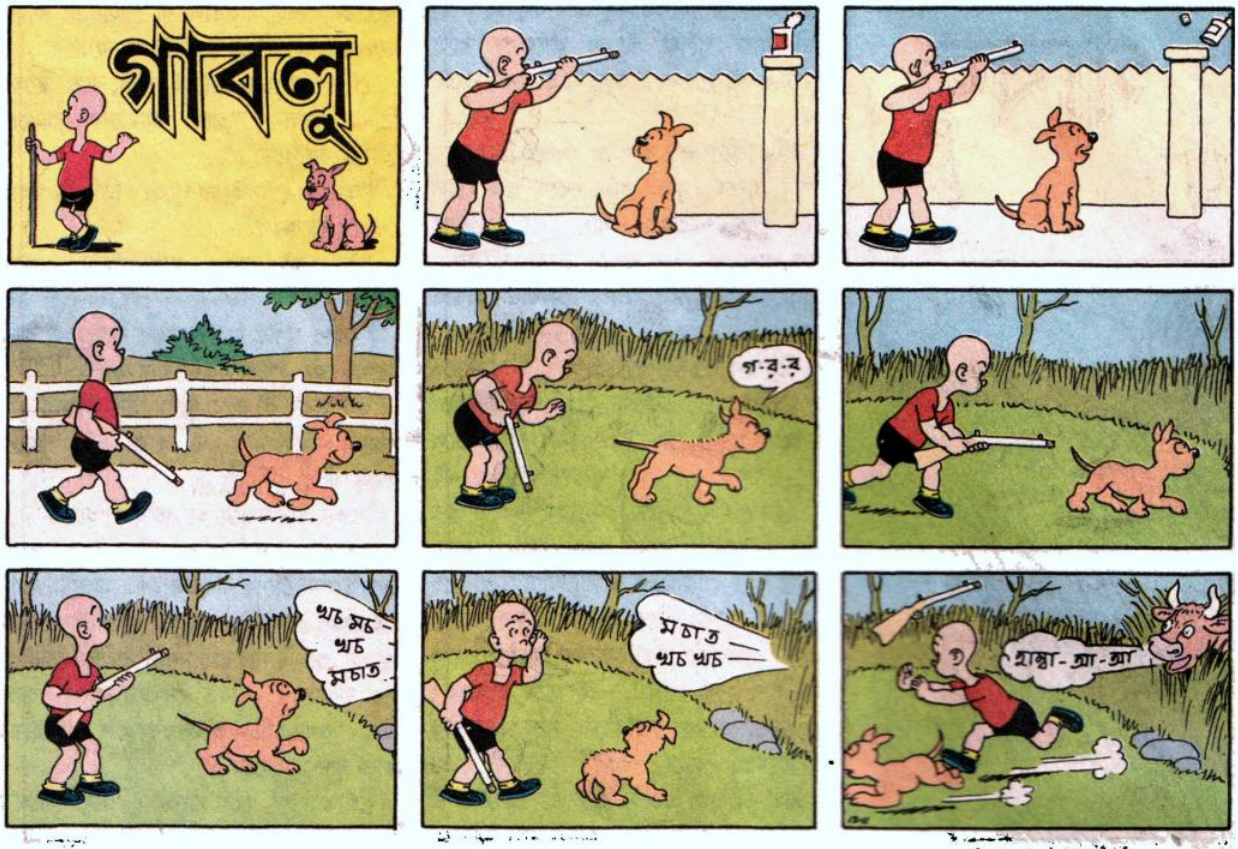
গাবলু
গ-র-র
খচ মচ খচ মচাত
মচাত খচ খচ
হাম্বা-আ-আ

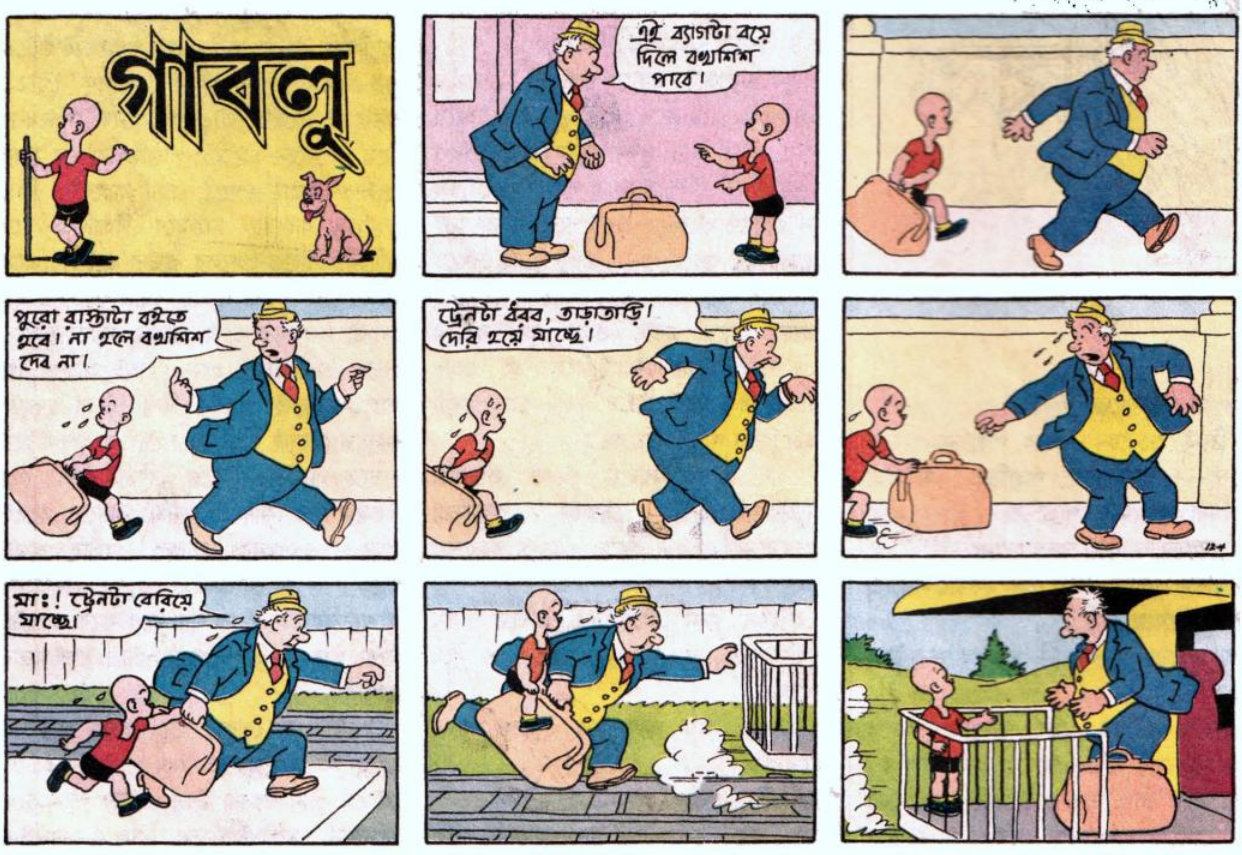
গাবলু
এই ব্যাগটা বয়ে দিলে বখ্যিশ পাবে।
পুরো রাস্তাটা বইতে হবে। না হলে বখ্যিশ দেব না।
ট্রেনটা ধরব, তাড়াতাড়ি! দেরি হয়ে যাচ্ছে।
যাঃ! ট্রেনটা বেরিয়ে যাচ্ছে।

গাবলু
উঃ! ঝোড়ো বাতাস!
টুপি কুড়িয়ে কিছু রোজগার করা যায়!
উঃ
চিন্তা করবেন না. আপনার টুপিটা এনে দিচ্ছি।
এই.. ওটা আমার টুপি!
হ্যাঁ, এটা আমার
আমার
ওটা আমার নয়। না, এটাই
মাপে না! আমার নয়।

গাবলু
চলো, টিপ প্র্যাকটিস করা যাক।
আমি পাঁচিলের ও-পাশে আছি। তুমি এখান থেকে গুলতি ছুঁড়ে টুপিটাতে লাগাও।
দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!
এই রে! ধরা পড়ে যাওয়ার আগে পালাই!

(৬১ পাতার পর)

প্রায় ওপরেই একটা বিশাল বটগাছ আর ওই প্রকাণ্ড গাছটার বড়-বড় মোটা শক্ত ঝুরি নেমে এসেছে একেবারে নীচ পর্যন্ত। ওগুলো সহজেই ধরা যাবে, ওগুলো ধরে ঝরনা-গুহার পাশে খাড়া পাহাড়ের গায়ে পা-রেখে ওপরে ওঠা যায় চেষ্টা করলে, খুব তাড়াতাড়িও পৌঁছে যাওয়াও যাবে ওপরের গুহার পেছন দিকটাতে। কিন্তু খুবই বিপজ্জনক এভাবে ওপরে যাওয়াটা। একটু এদিক-ওদিক হলেই অনেক নীচে যেখানে ঝরনার জল জোরে খাড়া পড়ছে একটা বিরাট গর্তের মধ্যে, সেখানে গিয়ে পড়তে হবে। ওই গর্তটাকে সবাই বলে ঝরনা-পুকুর। ওই ঝরনা-পুকুরে প্রচণ্ড ঘূর্ণি আর স্রোতের মধ্যে পড়লে বাঁচা খুবই মুশকিল! এদিক-ওদিক পড়লে তো পাথরে মাথা ঠুকে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। যাক, আজ রাতে আর এ-কাজ করব না, আগামীকাল রবিবার খুব সকালে আসা যাবে, দিনের আলোতে কাজ করতেও সুবিধে হবে।"

বাড়ি ফেরার জন্য এগোচ্ছেন, হঠাৎ মনে হল, "গাছটা কত উঁচুতে একটু ভাল করে দেখে রাখি।" একটু পিছিয়ে একটা বড় পাথরের পাশে দাঁড়াতেই ছোট্ট একটা পাথরের টুকরো তাঁর গায়ে এসে পড়ল, ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন, একটা লোক ওই বটগাছের শক্ত ঝুরি বেয়ে নীচে নামছে। গৌতম পাথরটার আরও আড়ালে চলে যান। বটগাছের ঝুরি বেয়ে যে লোকটা নামল, সে তাঁকে দেখতে পায়নি। নেমেই সে চার পাশটা দেখে নিল, তারপর পাহাড় থেকে নামার জন্য নীচের দিকে হাঁটতে শুরু করল। বেশ লম্বা, ছ' ফুটের ওপরেই হবে, পিঠে একটা ব্যাগ, জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট না দেখা গেলেও বোঝা যাচ্ছিল লোকটার বয়স খুব বেশি নয়, বলিষ্ঠ চেহারা। লোকটা কিছুদূর এগোতেই গৌতম নিঃশব্দে লোকটার পিছু নেন। "কে এই লোকটা, ওপরে কোথায় গিয়েছিল? কেন গিয়েছিল? তা ছাড়া এই রাত্রেই বা কেন গিয়েছিল?" নানা চিন্তা গৌতমকে তোলপাড় করতে থাকে।

পাহাড়ের পথ শেষ হয়ে ঢালু জমিতে এখন তিনি নামছেন, এখন মাঝে-মাঝে বড়-বড় গাছ আছে, গাছের আড়ালে নিজেকে গোপন রেখে লোকটাকে লক্ষ রাখতে পারছেন। লোকটা বারবার ফিরে-ফিরে চারদিক দেখছে। আর কিন্তু পিছু নেওয়া যাবে না, এবারে একদম সমতলভূমি, কোথাও গাছ নেই, ঝোপঝাড়ও নেই, বৈশাখ মাস শস্যহীন, রুক্ষ মাটি চারদিকে। বাধ্য হয়ে তিনি শেষ বড় মহুয়াগাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। চাঁদের আলোয় দেখলেন, এই লম্বা লোকটা শহরের দিকে না এগিয়ে পশ্চিম দিকের একটা সমাধির দিকে চলেছে। তবে কি ওই লম্বা লোকটা ভূত? হাসি পেল তাঁর। যাই হোক, কাল সকালেই আসতে হবে, দেখতে হবে গুহার ভেতর ঢোকা যায় কিনা!

সকাল হতেই মুখ-হাত ধুয়ে কিছু খাবার খেয়েই বের হয়ে পড়েন গৌতম। তাঁর সঙ্গে শুধু একটা ঝোলা। তাতে আছে খাতা-কলম, দড়ি আর টর্চ। শহরের পিচের রাস্তা ছাড়িয়ে, মাঠ-ঘাট ছাড়িয়ে, পাহাড়ের ঢালের ওপর দিয়ে, ঝরনার পাশ দিয়ে-দিয়ে ওপরে উঠতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরই ঝরনার উৎস-গুহার মুখের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা ওপরে উঠে গেছে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। ঝরনা-গুহার ওপরের বটগাছের লম্বা ঝুরিগুলো প্রায় রাস্তার কাছাকাছি নেমে এসেছে, বেশ শক্ত আর মোটা ঝুরিগুলো, কিছু ঝুরি ঝরনার জলের দিকেও নেমে গেছে। গৌতম বেশ বড় ও শক্ত কয়েকটা ঝুরি হাত দিয়ে টেনে-টেনে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে নিলেন। ঝোলা থেকে দড়িটা বের করে তাতে ফাঁস লাগিয়ে ছুড়ে দিলেন গাছের একটা শক্ত ডালে। দু-তিনবার চেষ্টার পরই গাছের ডালে ফাঁসটা আটকে গেল। এবার দড়ি আর ঝুরি একসঙ্গে ধরে পাথরে পা রেখে ধীরে-ধীরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে থাকেন সাবধানে। শেষপর্যন্ত পৌঁছে যান ওপরের গুহার পেছন দিকটাতে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখে নেন, তারপর দড়িটা ডাল থেকে খুলে পাকিয়ে ঝোলার ভেতর ভরে চিন্তা করতে থাকেন গুহার ভেতর ঢুকবেন কী করে! পাহাড়ের গায়ে হাত রেখে এদিক-ওদিক ঘুরছেন, হঠাৎ মনে হল পাহাড়ের একটা পাথর নড়ছে, দেখলেন একটা বড়মতো ফাটা গোল দাগ আছে পাথরের গায়ে। দাগটা দেখে মনে হচ্ছে অল্প কিছুদিন আগেই পাথরের এই অংশটা কাটা হয়েছে। জোরে ধাক্কা দেন গৌতম পাথরটার গায়ে, পাথরটা গড়িয়ে ভেতরে পড়ে যায়। একটা মানুষ সহজেই ভেতরে ঢুকতে পারে গর্তটা দিয়ে।

গৌতম গোল গর্তটা দিয়ে ভেতরে নামতেই বুঝতে পারেন, তিনি ঠিক জায়গায়, অর্থাৎ কানুডো গোঁসাইয়ের গুহায় এসে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু তিনি চিন্তিত হন কেউ একজন নিশ্চয় এর ভেতর আসা-যাওয়া করছে। কে সে? আর কেনই-বা সে এখানে আসছে? গুহার ভেতর কি অনেক ধনসম্পত্তি লুকনো আছে কিংবা অন্য কোনও মূল্যবান জিনিসপত্র? সে আজও আসতে পারে যে-কোনও সময়ে। এসেই যাতে তাঁর আসাটা টের না পায় তাই পাথরটাকে তুলে কষ্ট করে ঠিক জায়গামতো বসিয়ে দেন। গুহার ভেতরটা অন্ধকার হয়ে

যায়। টর্চ জ্বেলে গৌতম চারদিকটা দেখতে থাকেন। গুহাটা বিশেষ বড় নয়, কোথাও কিছু নেই, শুধু গুহার মাঝখানে একটা বেদি, বেদির ওপর প্রায় এক হাত উঁচু একটা মূর্তি। গৌতম মূর্তির ওপর টর্চ ফেলে দেখেন, এমন সুন্দর মূর্তি তিনি এর আগে কখনও দেখেননি। কিন্তু এ কী? কেউ মূর্তির পায়ের দু'পাশের পাথর ভাঙার চেষ্টা করেছে যন্ত্র দিয়ে। ভেঙেও ফেলেছে, এখন শুধু বেদি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া বাকি। টর্চের আলোয় গৌতম দেখেন, বেদির সামনের মেঝেতে কফিনের মতো লম্বা কাঠের বাক্স। এগিয়ে যান তিনি বাক্সটার কাছে, টর্চের আলোতে দেখেন, বাক্সের ওপরের ঢাকনাটা ভাঙা। ঢাকনাটা খুলে ফেললেন, চমকে দু'পা সরে আসেন, বাক্সের ভেতর একটা ক্ষয়ে যাওয়া কঙ্কাল। আবার এগিয়ে টর্চের আলো ফেলেন বাক্সের ভেতরে, দেখতে পান কঙ্কালের বুকের ওপর রয়েছে একটা পুঁথি। পুঁথিটি তুলে নিয়ে মাটিতে রাখেন। পুঁথির ওপর প্রাচীন বাংলা লিপিতে লেখা! 'কানুগো গোসাঞি-মঙ্গল।' —১৪৩৯ শকাব্দ। অর্থাৎ এই শকাব্দটি খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তন করলে হয় ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দ। "পুঁথির ওপরের পৃষ্ঠা থেকে মনে হচ্ছে পুঁথিটি ১৪৩৯ শকাব্দে লেখা আরম্ভ হয়।" পুঁথিটি কার লেখা জানার প্রবল আগ্রহে পুঁথির পৃষ্ঠা উলটে যেতে থাকেন তিনি। শেষ পৃষ্ঠায় কবি তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। "তা হলে বোঝা যাচ্ছে ঈশ্বর মালটো যাঁকে এখন এঁরা ইশ্‌র মালটো বলছেন, পুঁথিটি তাঁরই লেখা, বহু রাত পর্যন্ত জেগে তিনি

মশাল জ্বেলে তা হলে পুঁথি লিখতেন। এই গুহাটি ছিল তাঁর মন্দির। থাকার জায়গা। মূর্তিটি যিনিই তৈরি করুন না কেন, খুবই সুন্দর।" এবার গৌতম মাটিতে বসে পড়ে বলল, "পুঁথিতে কী লেখা আছে দেখতে হবে, পড়েই ফেলা যাক পুঁথিটা।"

ঠিক তখনই জোরে ধুপ করে একটি শব্দ শুনে পুঁথিটি ঝোলার ভেতর ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন গৌতম। গুহার একপাশের দেওয়ালের আলগা পাথরটা সরিয়ে গুহার ভেতর ঢুকেছে সেই লম্বা লোকটা। লোকটা অবাক হয়ে গৌতমের দিকে তাকিয়ে আছে। গোল গর্তটা দিয়ে আলো আসছে গুহার ভেতর, গৌতম এবার চিনতে পারেন, ট্রোর্ডি বোন্‌সকে। একেই তা হলে কাল দেখেছিলেন। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে কলেজে ভর্তি হয়েছিল ট্রোর্ডি, কিন্তু কয়েক মাস পরেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়।

"কী ব্যাপার ট্রোর্ডি, তুমি এখানে?"

"আমিও তো আপনাকে এই একই প্রশ্ন করতে পারি!" বেশ রুক্ষ স্বরে বলল ট্রোর্ডি।

"আমি ইতিহাসের অধ্যাপক, ইতিহাস খুঁজছি, কিছু মূল্যবান তথ্যও পেয়েছি।

"তুমি?"

"আমি আজ এসেছি মূর্তিটা নিয়ে যাব বলে, টাকা-পয়সা, অল্প কিছু সোনা-রুপো আগেই সরিয়েছি, দেখছেন না, দেওয়ালের পাথর অনেক জায়গায় ভাঙা, মূর্তির গায়েও কোনও অলঙ্কার নেই।" বিদ্রূপের হাসি হাসল ট্রোর্ডি।

"এত সুন্দর মূর্তিটা তুমি নিয়ে যাবে?"

"যাবই তো, যদি ওটা বিক্রি-টিক্রি করে কিছু পয়সা পাওয়া যায়।"

"হ্যাঁ, ওই বাক্সটার মধ্যে কিছু নেই। শুধু ইশ্‌র মালটোর কঙ্কাল আর একটা পুঁথি ছাড়া।"

"আমি দেখেছি, পুঁথিটাই আমার দরকার।" গৌতম বললেন।

"কেন, কেন? পুঁথিটার মধ্যে কোনও গুপ্ত ধনের সন্ধান আছে নাকি? ওটা আমাকেই দিয়ে দিন। আচ্ছা দাঁড়ান, আগে মূর্তিটা ব্যাগে নিই।"

গৌতম ট্রোর্ডির কথার মাঝখানেই বললেন, "তুমি তো টাকা-পয়সা, অন্য সব কিছুই নিয়েছ, মূর্তিটা যেখানে ছিল সেখানে থাকতে দাও না!"

ট্রোর্ডি গৌতমের কথায় চটে যায়, মূর্তিটা তোলার আগে গৌতমের দিকে ফিরে বলে, "আমি মূর্তিটা এখান থেকে নিয়ে যাবই, তাতে আপনার কী? তা ছাড়া আপনি কি ভাবছেন এখান থেকে আর বের হতে পারবেন? আপনাকেও ইশ্‌র মালটোর কঙ্কালের সঙ্গে কঙ্কাল হয়েই এখানে থাকতে হবে।" বলেই সে হিংস্র চোখে তাকাল গৌতমের দিকে। তারপর ব্যাগটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মূর্তিটা বেদি থেকে তোলার জন্য তৈরি হতে লাগল।

গৌতম বুঝতে পারলেন তাড়াতাড়ি যদি এখান থেকে বের হয়ে পালাতে না পারেন, তবে ট্রোর্ডি তাঁকে মেরে ফেলবে, পুঁথিও কেড়ে নেবে।

গৌতম তাড়াতাড়ি বের হয়ে তাঁর দড়ি আর গাছের ডালে না বেঁধেই বটগাছের ঝুরি ধরে নীচে নামতে থাকেন। ইতিমধ্যে ট্রোর্ডি ব্যাগে মূর্তিটা ভরে ঘুরে গৌতমকে গুহায় না দেখে ছুটে আসে। "পালালে চলবে না সার, এখনই গিয়ে তো থানায় খবর দেবেন, সেটি কিছুতেই হতে দেব না।" বলতে-বলতে ট্রোর্ডিও বটের ঝুরি ধরে ফেলে। ভীষণ জোরে দুলতে থাকে বটের ঝুরি। গৌতম বটের ঝুরি ধরে বেশ কিছুটা নীচে নেমে এসেছেন, ট্রোর্ডি ঝুরি ধরে নামছে আর নামতে-নামতে পা দিয়ে গৌতমকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। ফলে বটের ঝুরি আরও জোরে দুলতে থাকে, একটু পরেই বটের ঝুরিগুলো দু'জনের ভার সহ্য করতে না পেরে ছিঁড়ে যায়। দু'জনেই ছিটকে পড়ে যান নীচে। গৌতম ঝরনার জল যেখানে অনেক উঁচু থেকে পুকুরে পড়েছে সেখানে গিয়ে পড়েন। ওপরের জলের ধারা পুকুরে পড়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণি আর স্রোতের সৃষ্টি করেছে, সেখানে পড়তেই গৌতমের কাঁধ থেকে ঝোলাটা ছিটকে জলে পড়ে যায়। এদিকে ঝোলাটা ভেসে যাচ্ছে দেখে তিনি কোনওরকমে সাঁতার কেটে ঝোলাটাকে ধরার চেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু অসম্ভব! নিজেই তিনি তখন প্রায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। অনেক কষ্টে তীব্র স্রোত ঠেলে কোনওরকমে সাঁতার কেটে পুকুর পার করে ঝরনার খাদের একপাশে এসে পৌঁছলেন, তখন তাঁর সব শক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কোনওরকমে খাদের ধারে একটা পাথর ধরে রাস্তার ওপর উঠে বসেন। এবং সঙ্গে-সঙ্গে লুটিয়ে পড়েন, অজ্ঞান হয়ে যান।

একদিন পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এসেছে, দেখেন তিনি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন। তখন সকালবেলা। তাঁর অধ্যাপক বন্ধুদের বেশ কয়েকজন পাশে বসে আছেন। ডাক্তারবাবু তাঁকে ভালভাবে পরীক্ষা করছেন।

গৌতম চোখ খুলতে দেখেন অরুণ ঘোষ বলেন, "এই যে জ্ঞান ফিরেছে, ভাগ্যিস গতকাল হাটের দিন ছিল, ওপর থেকে আদিবাসীরা দলে-দলে হাটে যাচ্ছিল, আপনাকে দেখে চিনতে পেরে হাসপাতালে নিয়ে আসে, তাই সময়মতো চিকিৎসাও হয়েছে, না হলে কী যে হত! ওরা কিন্তু সত্যি আপনাকে খুব ভালবাসে।"

গৌতম একটু হাসলেন, তারপর বললেন, "আচ্ছা, ট্রোর্ডি কেমন আছে?"

এবার জবাব দিলেন ডাক্তার শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, "ট্রোর্ডিকেও পাওয়া গেছে, তবে মৃত অবস্থায়, কারণ, ঝরনা-পুকুরের ধারে একটা বড় ধারালো পাথরের ওপর পড়ে ওর মাথাটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। এই আপনাকে দেখেই, ওকে পোস্টমর্টেম করতে যেতে হবে।"

বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে, গৌতম সেন এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, বাড়িতে ফিরেছেন, কলেজেও যাচ্ছেন আর তাঁর পুরনো অভ্যাস পাহাড়-জঙ্গলেও ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ঝরনা-পুকুরের ধারে-ধারে, ঝরনার খাদের আশপাশে অনেক খুঁজেছেন নিজের ঝোলাটা। নাঃ, কোথাও পাননি। খুব সম্ভব ঝরনার জলের সঙ্গে গঙ্গায় চলে গেছে ঝোলাটা, আর সেইসঙ্গে মূল্যবান পুঁথিটাও।

এখনও মাঝে-মাঝে গৌতম ঝরনা-পুকুরের কাছে কিংবা ঝরনার খাদের কাছাকাছি জায়গাগুলো খুঁজে দেখেন আর তখনই তাঁর ইশ্‌র মালটোর ক্ষয়ে যাওয়া কঙ্কালটার কথা বারবার মনে পড়ে। তাঁর মনে হয়, ঝরনার শব্দের মধ্যে তিনি যেন ইশ্‌র মালটোর করুণ কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন, "দাদা গো, আমার চৈতন্য-কানুগো গোসাঞি মঙ্গল পুঁথিটা আপনি হারিয়ে ফেললেন! আমার সমস্ত প্রাণ যে ওই পুঁথিটার মধ্যেই ছিল, আমি এখন কী নিয়ে থাকব!"

ছবি : দেবাশিস দেব

গর্জিলা

আমাদের পরিচিত শ্রদ্ধাভাজন এক ব্যক্তিকে আজ রাত্রে টিভিতে দেখা যাবে !
গর্জিলা ?

না...মিঃ ওয়েদারবি !

বুব টিউবে আমাদের নির্ভীক নেতাকে দেখতে পার ?
হ্যাঁ.....

শিক্ষা নিয়ে সপ্তাহে আধ ঘন্টা তিনি স্থানীয় এক কেব্‌ল চ্যানেলে ভাষণ দেন ।
5-7

মিঃ ওয়েদারবি, আপনি শুরু করার আগে জানিয়ে রাখি....

আপনার জনপ্রিয়তা বাড়াতে আপনার অনুষ্ঠানে আমরা ওদের নিচ্ছি...ওই ওরা...

"ওয়েদারবি মেয়েরা !"
দাও একটা ও !... দাও একটা য়ে !... দাও একটা দা !...

কার পোস্টার

বিশ্বের সেরা এক ক্রিকেটারের মূল্যবান আর্ট-পেপারে ছাপা, সংগ্রহে রাখার মতো রঙিন বড় পোস্টার 'আনন্দমেলা'র পাঠক-পাঠিকাদের আমরা বিনামূল্যে দিতে চাই। পোস্টারের ছবিটি আটটি অংশে ভাগ করে এক-একটি অংশ ১০ মে সংখ্যা থেকে প্রকাশ করা হচ্ছে। ছবির প্রতিটি অংশে নম্বর দেওয়া আছে। এক থেকে আট পর্যন্ত নম্বর মেলালেই পোস্টারের ছবিটি সম্পূর্ণ হবে।

নিয়মাবলী

১ নীচের কুপনটি সম্পূর্ণ পূরণ করে আনন্দমেলা পত্রিকার ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

২ কুপনের জেরক্স কপি বা অন্য কোনও কপি গৃহীত হবে না। মূল কুপনটি শুধু গৃহীত হবে।

৩ পোস্টারের ছবির নম্বর দেওয়া অংশগুলিও (এক থেকে আট নম্বর পর্যন্ত মিলিয়ে) কুপনের সঙ্গে পাঠাতে হবে।

৪ এক থেকে আট পর্যন্ত প্রতিটি নম্বর মিলিয়ে পোস্টারের মোট আটটি অংশ যারা পাঠাবে, শুধু তাদেরই দেওয়া হবে এই পোস্টার। বিচ্ছিন্নভাবে ছবির অংশগুলি পাঠানো হলে তা গৃহীত হবে না। প্রতিটি অংশের সঙ্গে সম্পূর্ণ পূরণ করা কুপনও পাঠাতে হবে। অর্থাৎ, আটটি অংশের সঙ্গে পাঠাতে হবে আটটি কুপন।

৫ খামের ওপর 'রঙিন পোস্টার' কথাটি অবশ্যই লিখতে হবে।

৬ মোট আটটি অংশ সম্পূর্ণ হলে, তবেই আনন্দমেলার দফতরে পাঠাতে হবে। তার আগে নয়।

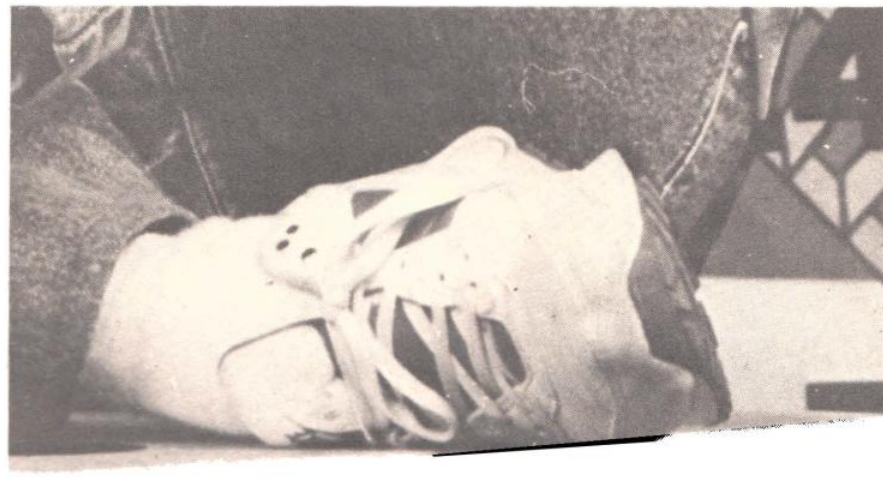

৫

কুপন—৫

আনন্দমেলা

নাম .....

ঠিকানা .....

বয়স .....

স্কুল/কলেজ .....

অভিভাবকের নাম .....

কলকাতায় তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞাননগরী

নৌকো করে সুন্দরবনের এক খাঁড়িপথে আমরা ক'জন চলেছি। দু'পাশে গরাণ, সুন্দরী, গেঁওয়া, ধুঁধুল, নানা জাতের গাছের অরণ্য। মাথার ওপর দিকে একঝাঁক পাখি উড়ে গেল। দারুণ মজা লাগছে। হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে এক ভয়ানক গর্জন। এদিকে নৌকোর গতিও ক্রমশ কমে আসছে। সামনের দৃশ্য দেখে শিড়দাঁড়া দিয়ে হিমস্রোত বয়ে গেল। কয়েকটি হরিণ কচিপাতার লোভে এসেছিল পাড়ের কাছে। হঠাৎ গর্জনের সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুতের মতো এক বিশাল রয়াল বেঙ্গল টাইগার ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা হরিণের ওপর। —এ পর্যন্ত পড়েই, যাদের সুন্দরবন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে, তারা ভাবছে এ কী গালগল্প রে বাবা! পাখি যদিও-বা দেখা যায়, বাঘ দেখা তো লটারি পাওয়ার শামিল। আর বাঘের হরিণ শিকার এ-পর্যন্ত কোনও পর্যটক দেখেছেন কি না সন্দেহ আছে। কিন্তু এবারে সুন্দরবনের অবিকল এই দৃশ্যই দেখা যাবে, খোদ কলকাতার বুকে, প্রস্তাবিত বিজ্ঞাননগরীতে। তবে আজই নয়, এই দৃশ্য দেখতে অপেক্ষা করতে হবে আরও চার বছর। বিজ্ঞানের জাদুঘর নয়, নয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বা হরেক মডেলের বিজ্ঞান মেলা, একেবারে 'বিজ্ঞান নগরী' বা 'সায়েন্স সিটি'। আমেরিকায় এরকম প্রকল্প থাকলেও এশিয়ায় এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। পার্ক সার্কাসের কাছে ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে প্রায় ৫০ একর শুকনো, জঞ্জালভর্তি জমিতে এই সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বিজ্ঞাননগরীর পরিকল্পনা নেওয়া

পার্ক সার্কাসের কাছে,
ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে
বিপুল খরচে তৈরি হচ্ছে
সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন এক
বিজ্ঞাননগরী।
এশিয়ায় এই ধরনের
উদ্যোগ এই প্রথম।
লিখেছেন
সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে গড়ে উঠছে বিশাল বিজ্ঞাননগরী ফোটো : অশোক মজুমদার

হয়েছে। কাজ শুরু হয়েছে ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি। প্রথম পর্যায়ের কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে। পাঁচ বছর ধরে ধাপে ধাপে প্রায় ১২৫ কোটি টাকা খরচে গড়ে উঠবে এই স্বপ্নের নগরী, কলকাতার নতুন দ্রষ্টব্য। কী কী থাকবে এই বিজ্ঞান-শহরে ? তার চেয়ে বলা সহজ কী থাকবে না।

বিজ্ঞানের নানা শাখার বিভিন্ন গ্যালারি তো থাকবেই। তার সঙ্গে থাকবে এমন অনেক কিছু, যাতে কলকাতা বিশ্বের অনেক বড় শহরকেই টেক্কা দিতে পারে। বিজ্ঞাননগরীর কিছু অভিনব গ্যালারির কথা শোনা যাক। প্রথমত, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরার জন্য তিনটি মডেল পরিবেশ তৈরি করা হবে। সুন্দরবনের কথা তো আগেই বলেছি। তবে ওই বাঘ, হরিণরা কিন্তু সত্যি নয়, 'অ্যানিমেটেড'। সুন্দরবনে ওইভাবেই জঙ্গল ও প্রাণীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়াও থাকবে থর মরুভূমি ও হিমালয়ান ফরেস্ট বা তরাই-এর বনাঞ্চল। তবে উট বা হাতির পিঠে নয়, মরুভূমি আর জঙ্গলের বুকে পায়ে হেঁটে বেড়াতে হবে। প্রায় ৪০ হাজার বর্গফুট জমিতে সুন্দরবনের মডেল তৈরি করা হবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে গাছপালা, পোকামাকড়, পশুপাখি প্রত্যেকেরই ভূমিকা আছে। এজন্য এদের রক্ষা করা জরুরি, আর এই ব্যাপারটা কেবল পুঁথিগত শিক্ষার সাহায্যে নয়, বোঝানো যায় প্রকৃতির মধ্যে থেকে। প্রকৃতিকে ভালবাসার স্বাভাবিক উপলব্ধির জন্যই এই কৃত্রিম পরিবেশগুলির পরিকল্পনা, জানালেন ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়মের (NCSM) অধিকর্তা ডঃ সরোজ ঘোষ। এই বিজ্ঞাননগরী ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়মের ব্যবস্থাপনায় তৈরি হচ্ছে। কেন এই প্রকল্পকে সায়েন্স সিটি বলা হচ্ছে জানতে চাইলে ডঃ ঘোষ জানালেন, একটি শহরে যা-যা থাকে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, রেলগাড়ি, রেস্তরাঁ, অডিটোরিয়াম ইত্যাদি সবই থাকবে এখানে, থাকবে না শুধু মানুষের বসবাস। এইজন্যই মিউজিয়ম বা পার্ক নয়, নাম রাখা হয়েছে সায়েন্স সিটি বা বিজ্ঞাননগরী।

এই প্রকল্পের আর-একটি নতুনত্ব হল—প্রায় সমস্ত দর্শনীয় জায়গাতেই বাস থেকে নেমে প্রবেশপথে লাইন দিতে হয়। কিন্তু এই শহরের মূল অংশে ঢোকার আগে একটি বিশাল অঞ্চল থাকবে দর্শনী-মুক্ত এলাকা। এই অংশেও পার্ক, ঝরনা, রেস্তরাঁ, কফিশপ সবই থাকবে। তারপরে মূল শহরে ঢোকার গেট। শহরে ঢোকবার জন্য ন্যূনতম দর্শনীর ব্যবস্থা রাখা হবে।

ভেতরেও একমাত্র স্পেস ক্র্যাফ্‌ট ছাড়া অন্য কোনও গ্যালারির জন্য আলাদা টিকিট লাগবে না। সেই ১৯৬২ সালে সোভিয়েত মহাকাশচারী ইউরি গাগারিনের পর কতজনই তো পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মায়া কাটিয়ে মহাশূন্যে ঘুরে এলেন। কিন্তু কেমন লাগে মহাশূন্য ! মাধ্যাকর্ষণমুক্ত ছুটন্ত মহাকাশযানের মধ্যে শরীরের অনুভূতি কীরকম হয়, এই সবই অনুভব করা যাবে সায়েন্স সিটির মডেল স্পেস ক্র্যাফ্‌টের ভেতরে ঢুকলে। কয়েক কোটি টাকা খরচে তৈরি এই মহাকাশযানের মডেলের মধ্যে কৃত্রিমভাবে ভারশূন্য অবস্থার সৃষ্টি করা হবে। মাধ্যাকর্ষণবিহীন অবস্থায় ভাসতে-ভাসতে কল্পনার মহাকাশ অভিযান সত্যি হয়ে উঠবে।

গ্যালারি তো এই শহরে অনেক থাকবে। তবে সবচেয়ে চমক দেবে বোধ হয় ইভলিউশন গ্যালারি। সৌরজগৎ সৃষ্টি থেকে মানুষের আবির্ভাব, বিবর্তনের সবক'টি স্তর এখানে সুন্দরভাবে হবে। জুরাসিক যুগের অংশে থাকবে বিশাল-বিশাল অ্যানিমেটেড ডাইনোসর, যার একটিকে আর কিছুদিনের মধ্যেই বি আই টি

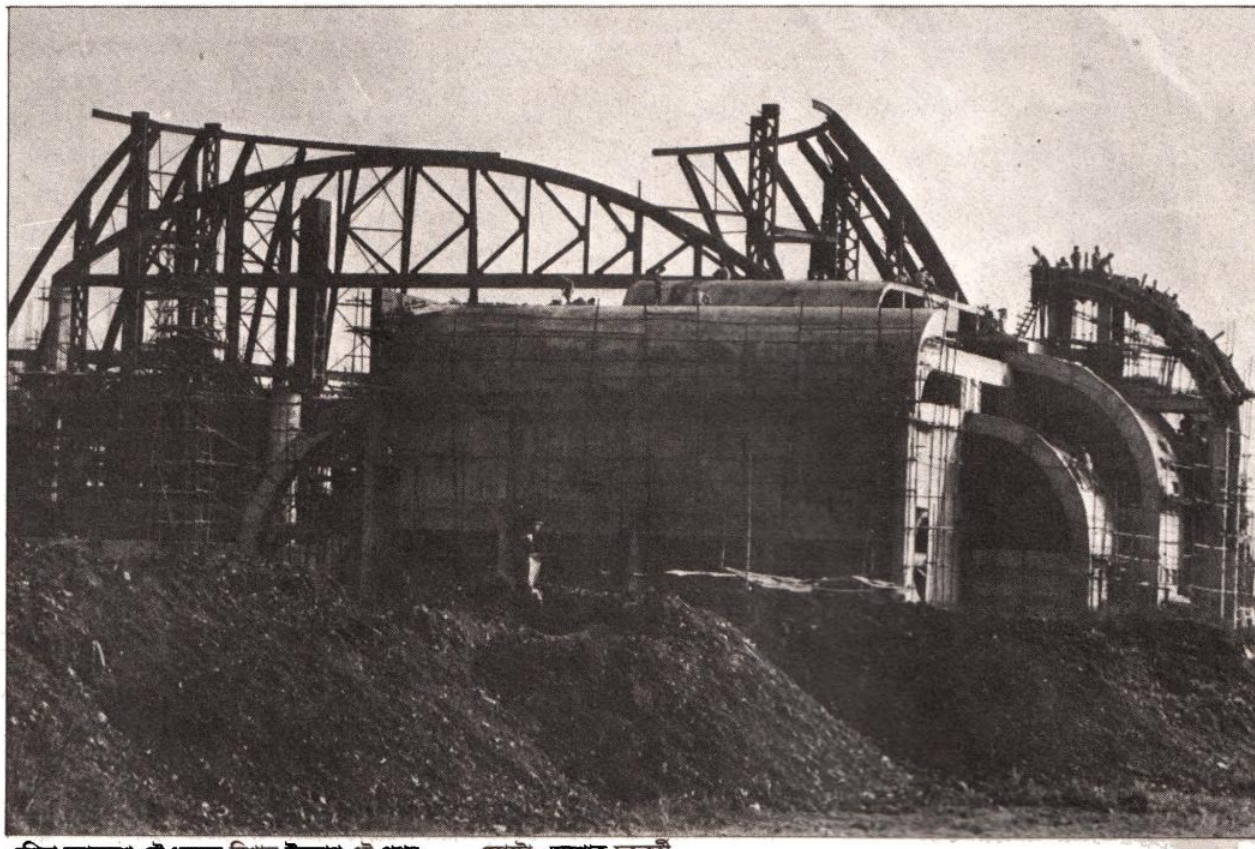

এশিয়া মহাদেশে এই ধরনের বিশাল উদ্যোগ এই প্রথম ফোটো : অশোক চক্রবর্তী

এম-এ গর্জন করে লেজ আছড়াতে দেখা যাবে। ইভলিউশন গ্যালারিতে ঘুরতে-ঘুরতে মনে হবে আমরা চলে গেছি অন্য এক পৃথিবীতে। তবে শুধু জানা আর শেখাই নয়, এখানে থাকবে আনন্দের বিভিন্ন উপকরণও।

এই শহরেই দেখতে পাওয়া যাবে 'মনোরেল', জাপানের বাইরে এশিয়ার আর কোথাও এই জিনিস নেই। নিয়মিত বিজ্ঞানভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ভিডিও শো দেখানো হবে। দেখা যাবে গান, নাটক, সায়েন্স শো। তবে এ-ব্যাপারে টেক্কা দেবে এই শহরের মূল অডিটোরিয়াম। প্রায় ২৪ হাজার দর্শক ধরবে এই সভাগৃহে, স্টেজে একই সঙ্গে প্রায় ১০০ জন অভিনেতা শো করতে পারবেন।

বিজ্ঞাননগরীর আরও একটা চমক বাটারফ্লাই পার্ক। না, না মরা প্রজাপতির জাদুঘর নয়, রীতিমত জ্যান্ত প্রজাপতির 'চিড়িয়াখানা'। পৃথিবীর প্রায় সব প্রজাতির প্রজাপতির ডিম থেকে ইমাগো (পূর্ণাঙ্গ) স্তর পর্যন্ত দেখা যাবে এই প্রজাপতির চিড়িয়াখানায়। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কোথাও এত বড় বাটারফ্লাই পার্ক নেই। বিভিন্ন প্রজাতির প্রজাপতি বাঁচে তিনদিন থেকে ২১ দিন। আর এক সপ্তাহে ওইসব প্রজাপতির লার্ভারা যে গাছের পাতা খায় তা জন্মাতে সময় লাগে প্রায় দু' মাস। বিজ্ঞাননগরীর কর্মীরা গাছের জোগান ঠিক রাখতে টবে প্রচুর পরিমাণ গাছ চাষ করবেন, এবং বছরের প্রায় সবসময়ই সব ধরনের প্রজাপতির ডিম, লার্ভা, পূর্ণাঙ্গ— প্রত্যেক দশাই দেখা যাবে। মেলবোর্ন বাটারফ্লাই পার্কের বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় এই প্রজাপতির বাগান তৈরি করা হচ্ছে। "বিজ্ঞাননগরী কলকাতাতেই কেন ?"— এই প্রশ্নের উত্তরে ডঃ সরোজ ঘোষ জানালেন, "এই কলকাতা থেকেই এন সি এস এমের যাত্রা শুরু। সেই ১৯৫৯ সালে কলকাতায় প্রথম বিজ্ঞানের জাদুঘর বি আই টি এম তৈরি করা হয়। কিন্তু আজ ভারতে ২৩টি সায়েন্স মিউজিয়ম তৈরি করা হয়েছে। তাই বিজ্ঞাননগরীর প্রথম জায়গা হিসেবে কলকাতাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।" এন সি এস এমের কর্মীরা যখন ধাপার মাঠে কাজ শুরু করেন ('৯৪ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ), তখন তাঁদের গামবুট আর গ্যাস মাস্ক পরতে হত। জমির পাশের ডোবাটি ছিল ট্যানারির বিষাক্ত জলে ভরা, ছিল না কোনও প্রাণের অস্তিত্ব। এক বছর পরে আজ ওখানে এসেছে জীবনের ছোঁয়া, পুকুর ভরে উঠেছে প্লাঙ্কটন, ছোট ছোট মাছ, শামুক প্রভৃতির মাধ্যমে। ওদের টানে আসছে বক, মাছরাঙারা। শুকনো জমিতে লেগেছে সবুজের ছোঁয়া। ডঃ ঘোষ জানালেন, "সম্পূর্ণ জমিতে প্রায় এক লক্ষ গাছ লাগানো হবে। পাখিদের আকর্ষণ করতে ফলের গাছ (পেয়ারা, সবেদা, পেঁপে ইত্যাদি) লাগানো হবে। কলকাতাকে দূষণমুক্ত করতে এই গাছেরা বিরাট ভূমিকা নেবে। আশা করা যাচ্ছে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮-এর মধ্যে চারটি স্তরে এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।"

বিজ্ঞাননগরীর আরও একটা চমক বাটারফ্লাই পার্ক। না না, মরা প্রজাপতির জাদুঘর নয়, রীতিমত জ্যান্ত প্রজাপতির 'চিড়িয়াখানা'। পৃথিবীর প্রায় সব প্রজাতির প্রজাপতির ডিম থেকে ইমাগো (পূর্ণাঙ্গ) স্তর পর্যন্ত দেখা যাবে এই প্রজাপতির চিড়িয়াখানায়। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কোথাও এত বড় বাটারফ্লাই পার্ক নেই।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ত্রিশ

বাবলু বলল, "আমাদের প্রথম কাজই হল চায়নাকে ওর বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। তার পরের কাজ হল ডোরার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে বাদশার খোঁজখবর নেওয়া। তারও পরের কাজ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোয়ালিয়রের দিকে রওনা হওয়া।"

মা ততক্ষণে সকলের জন্য জলখাবার নিয়ে এসেছেন। তা খেয়ে চা-পর্ব শেষ করে ওরা চায়নাদের বাড়ির দিকে চলল।

ওরা সকলে গেলেও পঞ্চু গেল না। ও এখন বাড়িতেই থাকবে, ভাল মন্দ খাবে। তা ছাড়া এখন শুধু-শুধু ওদের সঙ্গে যাওয়ার দরকারই বা কী ?

চায়নাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে ওর বাবা-মায়ের সে কী আনন্দ ! মেয়েটা যে উদ্ধার হয়েছে এবং পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাছেই আছে এ খবর ওঁরা বাবলুর বাড়ি থেকেই জেনেছেন। তবু মেয়েকে ফিরে পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন দু'জনে।

এর পর বাবলুরা চলল ডোরাদের বাড়ি।

কিন্তু ডোরাদের বাড়ি এসেই অবাক !

ওরা দরজায় টক-টক শব্দ করতেই হাসি-হাসি মুখ করে ডোরা এসে দরজা খুলে দিল ওদের।

বিস্মিত পাণ্ডব গোয়েন্দারা বলল, "এ কী ! তুমি এখানে ?"

"কেন ? এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে ? আমি কি আমার বাড়িতে আসতে পারি না ?"

"নিশ্চয়ই পারো। তা হলে ওইভাবে চিঠি লিখে দলছুট হয়ে চলে আসার অর্থ কী ?"

"মানসিক চাপ। আউট অব কন্ট্রোল বলতে পারো।"

"ধরো, আমরা যদি তোমার খোঁজে বাড়ি না এসে ওখান থেকেই চলে যেতাম গোয়ালিয়রের দিকে ?"

ডোরা হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলল, "তা তোমরা কখনওই যেতে না। এসো, ভেতরে এসো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভেতরে ঢুকলে ডোরার মা-বাবাও এলেন।

ওরা একটা সোফায় আরাম করে বসলে ডোরা বলল, "তোমাদের শ্রীমানটি কই ?"

বাবলু বলল, "কার কথা বলছ, পঞ্চুর ? ও এখন আমার মায়ের আদর খাচ্ছে। যাক, তোমার দাদার খবর জানতে চাই। বাদশা এখন কেমন আছে ?"

ডোরার মা বলল, "একটু ভালর দিকে। তবে আরও কিছুদিন থাকতে হবে হাসপাতালে।"

"ওর মনোভাব কেমন বুঝছেন ?"

"সম্পূর্ণ অন্যরকম। মনে হয়, একেবারেই পালটে যাবে ছেলেটা।"

"গেলেই ভাল !"

ডোরার বাবা বললেন, "ও খুব অনুতপ্ত। নিজের ভুল ও এতদিনে বুঝতে পেরেছে। আসলে এই আঘাতটা না পেলে কিছুই হত না।"

এর পর বেশ কয়েকটি নীরব মুহূর্ত।

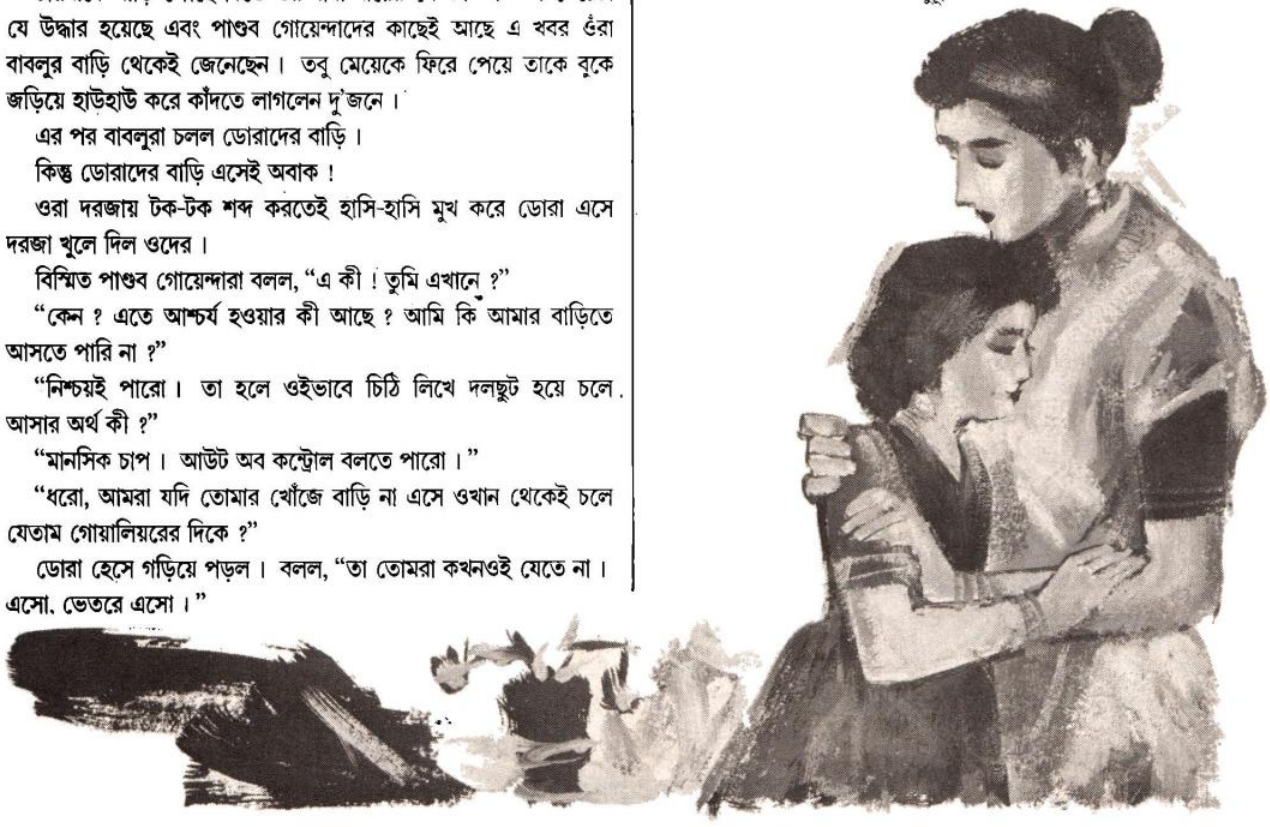

হাসিখুশি

"ও ভাই, আম কত করে ?"
"পনেরো টাকা কিলো।"
"যদি একসঙ্গে চার কিলো নিই ?"
"দাম কমাতে পারব না সার, ওই পনেরো টাকাই হবে।"
পনেরোটা টাকা পকেট থেকে বের করে বটুকবাবু বললেন, "ঠিক আছে, তা হলে চার কিলোই দাও।"

দাদা ড্রেসিং টেবিলের সামনে চোখ বুজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ভাই অবাক হয়ে গেল। বলল, "তুই চোখ বুজে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে, দাদা ?"
"ঘুমিয়ে থাকলে আমাকে কেমন দেখায়, সেটা দেখার জন্য।"

ছবির বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল তাতাই। হঠাৎ সে দাদাকে জিজ্ঞেস করল, "আকাশটা এত উঁচু কেন বল তো দাদা ?"
দাদা তাচ্ছিল্যভরে বলল, "এটা বুঝলি না বোকা ? পাখির মাথায় যাতে ধাক্কা না লাগে, সেইজন্য।"

দোকানদার খদ্দেরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হতাশ হলেন। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে দোকানের জিনিসপত্র দেখলেন, কিন্তু কিচ্ছু কিনলেন না। এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কাজে লাগবে এরকম একটা দরকারি জিনিস আছে। কিনবেন ?"
খদ্দের ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, "জিনিসটা কী ?"
"পকেট-ক্যালকুলেটর।"
খদ্দের স্মিত হেসে বললেন, "ধন্যবাদ। কোনও দরকার নেই। কারণ আমার ক'টা পকেট, আমি জানি।"

অফিস ছুটির আগে প্রকাশবাবু তাঁর সহকর্মী দিলীপবাবুকে একটা খাম দিয়ে বললেন, "দিলীপ, চিঠিটা খুব দরকারি। একটু মনে করে পোস্ট করে দেবে ?"
দিলীপবাবু বললেন, "এ আর এমন কথা কী ! এসব ব্যাপারে আমার কখনও ভুল হয় না।" পরের দিন দিলীপবাবু অফিসে আসামাত্রই প্রকাশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "চিঠিটা কাল পোস্ট করেছিলে তো দিলীপ ?"
প্রকাশবাবুর কথায় দিলীপবাবু বেশ রেগে গেলেন, "লোককে তুমি বড় অবিশ্বাস করো প্রকাশ। এটা ভাল নয়। এই নাও তোমার চিঠি। তুমি নিজেই পোস্ট করে দাও।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ডোরার মা বললেন, "তোমরা বোসো। আমি তোমাদের জন্য একটু কিছু করে আনি।"

ডোবার বাবাও বাইরে গেলেন হয়তো কিছু কিনে আনতে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্থিরভাবে বসে রইল। ডোরার মুখেও কথা নেই।

একসময় বাবলুই নীরবতা ভঙ্গ করল। ডোরাকে বলল, "তোমার ব্যাপারে আমরা সকলে মনে-মনে খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। হঠাৎ করে এমন একটা ছেলেমানুষি করে ফেললে তুমি ! অথচ একটু যদি ধৈর্য ধরে আমাদের ফিরে আসবার জন্য অপেক্ষা করতে, তা হলে কিন্তু তোমার টেনশন অনেক কমত।"

"কীরকম ?"

"অজিত সিংয়ের ব্যাপারে তুমি তো সন্দেহের দোলায় দুলছিলে। লোকটা তোমার হাতে খুন হল, অথচ ওর ডেডবডি লোপাট হল কী করে ? এই একটি সন্দেহের দোলায় আমরাও দুলছিলাম। কিন্তু আমাদের নৈশ অভিযানের ফলে কী দেখলাম জানো ?"

ডোরা বলল, "কী দেখলে তোমরা ?"

"আমরা দেখলাম অজিত সিং তোমার হাতে খুন হয়নি। আর ডেড বডিও লোপাট হয়নি তার।"

ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে ডোরা বলল, "সে কী ! তবে তো ভয়ানক ব্যাপার। তার মানে বেঁচে আছে সে ?"

"না। সে বেঁচেও নেই। তাকে খুন করা হয়েছে।"

"কে করল এই কাজ ?"

"হীরালাল নামে এক দুর্বৃত্ত।"

ডোরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল বাবলুর মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "এ-ব্যাপারে তোমার কি কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?"

"আছে। ওই অল্প সময়ের মধ্যে এসব তোমরা জানতে পারলে কী করে ?"

"যদি তুমি পালিয়ে না আসতে, তা হলে তুমিও জানতে পারতে। যাক, এখন মন দিয়ে শোনো আমাদের কথাগুলো।" বলে সব কথা খুলে বলল বাবলু।

ডোরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে গেল সব।

বাবলু বলল, "এখনও কি চম্বলের উপত্যকায় যাওয়ার কোনও আগ্রহ আছে তোমার ?"

"একেবারেই নেই তা বলব না। কেননা জন্মভূমির টান একটা আছে তো ! তবে আপাতত নেই। কেননা আমার শত্রুর শেষ হয়েছে এইটার বড় কথা। আর চম্বলের বেহড় বেড়ানো ? কে যাবে অযথা ডাকাতের হাতে প্রাণ দিতে ? ওটা আমার মনের খেয়াল বলতে পারো। এখন আমি মাথা ঠাণ্ডা করে যেমন ছিলাম তেমনই থাকতে চাই।"

বাবলু রহস্যের হাসি হেসে বলল, "খুব ভাল কথা। আমরা কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই চম্বলে যাচ্ছি।"

ডোরা অবাক হয়ে বলল, "তোমরা কেন যাবে ? আমাকে নিয়েই যখন এত কাণ্ড, সেই আমিই যখন যাচ্ছি না তখন তোমরা যাবে কী জন্য ?"

ততক্ষণে ডোরার বাবা ফিরে এসেছেন। ডোরার মা-ও প্লেট-ভর্তি খাবার সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন ওদের জন্য।

বাবলু বলল, "আমরা যাব দুটো কারণে। এক, খুনি হীরালালের সন্ধান নিতে। দুই, গুপ্তধনের রহস্য ফাঁস করতে। কী এমন অমূল্য সম্পদ রয়েছে সেখানে, যার জন্য এত কিছু !"

ডোরা বলল, "আমিও যাব তা হলে।"

বাবলু বলল, "যেতে পারো। তবে আমাদের সঙ্গে নয় কিন্তু।"

"কেন, তোমাদের সঙ্গে নয় কেন ?"

ভোম্বল বলল, "যেহেতু তুমি আমাদের অবাধ্য হয়েছ !"

ডোরার দু' চোখে ক্রোধের আগুন ফুটে উঠল মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই স্থির হয়ে গেল সে। বাবলুর সেটা নজর এড়াল না।

বিলু বলল, "শুধু তোমাকে নয়। এই একই কথা চায়নাকেও জানিয়ে দিয়েছি আমরা।"

ডোরা বলল "সঙ্গে নেওয়া না-নেওয়াটা তোমাদের ব্যাপার। তবে তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের দু'জনের সঙ্গে সম্পর্কটা তোমরা আর রাখতে চাইছ না।"

বাবলু বলল, "তা কেন ?"

বিচ্ছু বলল, "আসলে আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কখনও মতের অমিল হয় না। বাবলুদা যা সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই চূড়ান্ত হয়। কিন্তু অন্যদের বেলায় তা হয় না। তাই এই সিদ্ধান্ত।"

ডোরা বলল, "তোমাদের আদর্শ অতি মহান। তোমরা জয়যুক্ত হও।"

বাবলু বলল, "শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। আমরা তা হলে আসি ?"

"আবার এসো এ-কথা তো বলব না। বেস্ট অব লাক। বাই, বাই।"

ডোরা দরজার কাছে এসে হাত নেড়ে বিদায় দিল ওদের।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যেতে গিয়েও বাবলুর নির্দেশে থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ে গেছে বাবলুর।

ডোরা বলল, "কী হল, কিছু বলবে ?"

"তোমার স্কুটারটা এক ফাঁকে গিয়ে নিয়ে এসো।"

"ওটা তো আমি তোমাদের গিফ্‌ট দিয়েছি।"

"সে তুমি মহাপ্রস্থানে যাচ্ছিলে বলে ! কিন্তু তা যখন হয়নি, যেতে গিয়েও ফিরে যখন এসেছ, তখন তোমারও তো ওটা দরকার।"

"দরকার তো বটেই। কিন্তু আমি যেতে গিয়েও কেন যে ফিরে এলাম, সে-কথা তো একবারও জিজ্ঞেস করলে না তোমরা ?"

বাবলু হেসে বলল, "করিনি বুঝি ? বেশ, বলো, তা হলে কেন হঠাৎ এই মতের পরিবর্তন ?"

"সে-কথা জানবার কোনও অধিকারই তোমাদের নেই। আর আমার দেওয়া উপহার তোমরা যখন নেবেই না, তখন আজই দুপুর অথবা বিকেলে গিয়ে নিয়ে আসব ওটা। নাউ, ইউ মে গো।"

বাবলু ডোরার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল একবার। তারপর সকলকে নিয়ে ফিরে এল যে যার বাড়িতে।

ডোরা কথা রেখেছিল। তাই দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পরই এসে হাজির হল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবে মিত্তিরদের বাগানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় এল। তবে একা আসেনি, চায়নাও ছিল সঙ্গে।

এই মুহূর্তে মেয়ে দুটিকে দেখতে খুবই ভাল লাগল ওদের। একজন যেমন কালো, অন্যজন তেমনই ফরসা। একজন যেমন হাসিখুশি, অন্যজন তেমনই উদাসীন।

বাচ্চু, বিচ্ছু হাসিমুখে হাত ধরল দু'জনের। দু'জনের সঙ্গে করমর্দন করে বাচ্চু বলল, "বেশ লাগছে কিন্তু তোমাদের দু'জনকে। মনে হচ্ছে যেন দু'জনের জন্যই দু'জন তোমরা।"

ডোরা হেসে বলল, "সকলকে তাই বলে। আর সেইজন্যই তো আমাদের মধ্যে এত মিল।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক সময়েই এসে পড়েছ তোমরা ! চলো, মিত্তিরদের বাগানে বসে সন্ধে পর্যন্ত চুটিয়ে আড্ডা দিই আমরা।"

ডোরা ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে বলল, "আমাদের হাতে এখন নষ্ট করবার মতন সময় একটুও নেই রে ভাই ! আমরা স্কুটারটা নেওয়ার জন্যই এসেছি।"

বাবলু তখনই ডোরার স্কুটার ফিরিয়ে দিল।

পঞ্চু কোথায় ছিল কে জানে ! ডোরা আর চায়নাকে দেখেই ছুটে এল সে। তারপর লেজ নেড়ে কুঁই-কুঁই করে ওদের পায়ের কাছে এসে ছটফট করতে লাগল।

ডোরা, চায়না দু'জনেই সস্নেহে গায়ে হাত বুলিয়ে দিল ওর।

ডোরা বলল, "তোমার মা কোথায় বাবলু ? দেখছি না যে ?"

বাবলু বলল, "মা একটু পাশের বাড়িতে গেছেন। তোমরা কি সত্যিই বসবে না ?"

ডোরা বলল, " আমরা আসছি।" বলে চায়নাকে নিয়ে চলেও গেল।

বাবলু বলল, "খুবই রেগেছে।"

বিলু বলল, "রাগ হল তো ভারী বয়েই গেল ! এইসব অস্থির প্রকৃতির মেয়েদের বেশি গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল।"

বাচ্চু বলল, "এখানে আর সময় নষ্ট না করে চলো বাগানে যাই।"

ওরা সকলে বাইরে এসে দরজায় তালা দিয়ে মিত্তিরদের বাগানের দিকে চলল। ডুপ্লিকেট চাবি মায়ের কাছে আছে। তাই অসুবিধে হবে না।

পঞ্চু যথারীতি সকলের আগেই চলল।

ওরা এল ধীর পায়ে।

বেশ কয়েকদিন পরে মিত্তিরদের বাগানে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওরা। প্রথমেই সবুজ ঘাসের বুকে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি খেয়ে নিল। তারপর দেহ-মন চাঙ্গা করে ওদের সেই প্রিয় গুলঞ্চ গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল সকলে। পঞ্চু টহল দিতে গেল বাগানময়।

বিলু বলল, "আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে কী ঠিক করলি তা হলে ?"

বাবলু বলল, "যাওয়া আমাদের হবেই। এই নিয়ে সারাটা দিন আমি অনেক চিন্তাভাবনা করেছি।"

ভোম্বল বলল, "তুই কি গুপ্তধনের ব্যাপারটা সত্যিই বিশ্বাস করিস ?"

"মোটেই না। গুপ্তধন গুপ্তস্থানেই থাকুক। কিন্তু ওর রহস্যটা কী, তা জানতে হবে। তার চেয়েও যেটা বেশি দরকার সেটা হচ্ছে সারদা নামের ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করে অজিত সিংয়ের বৃত্তান্তটা জানানো, সেইসঙ্গে হীরালালের ব্যাপারেও খোঁজখবর নেওয়ার।"

বিলু বলল, "তুই হীরালালের ব্যাপারটাকে এত বড় করে দেখছিস কেন ?"

বাবলু বলল, "কেন দেখছি জানিস ? চম্বল থেকে বৈশালী যার গতিবিধি, সে কিন্তু সামান্য নয়। যেভাবেই হোক ওদের ওই চক্রটাকে যদি ভাঙতে না পারি, তা হলে কিন্তু সমূহ বিপদ। দিনে-দিনে আরও সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠবে ওরা।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ওদের ওই দুর্ভেদ্য দুর্গে আমাদের শক্তি কতটুকু কাজ করবে ?"

"এসব ক্ষেত্রে শক্তি দিয়ে কিছু হয় না ভোম্বল। বুদ্ধি এবং সাহস দিয়ে কাজ করতে হয়।"

এমন সময় পঞ্চুর ভৌ-ভৌ চিৎকারে সচকিত হল সকলেই। আর সেই সময়েই যা ঘটল তার জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউই। কে জানত যে এমন কাণ্ডটা হবে ! পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে এ যেন এক নতুন চমক। **(ক্রমশ)**

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

সম্পূর্ণ উপন্যাস

(প্র থ মা ং শ)

পরমপ্রিয়

শিবতোষ ঘোষ

অনেকদিনের বন্ধু যদুবাবু, মধুবাবু। দু'জনে একসঙ্গে এক অফিসে চাকরি করেছেন, পাশাপাশি বাড়ি করেছেন, অবসরও নিয়েছেন একসঙ্গে।

একসঙ্গে চাকরি করতেন বলে যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল, তা নয়। বন্ধুত্ব হওয়ার মূল কারণ ছিল, দু'জনেরই অফিস করতে ভাল লাগত না, প্রায় রোজ অফিস-শেষে দু'জনে হাত-ধরাধরি করে বেরিয়ে আপসোস করতেন, "হায় রে, জীবনের মূল্যবান সময়টা আমরা অফিসের কলম পেষাইকর হিসেবেই কাটিয়ে দিলাম।" একজন যদি বলেন, "আমার কত দেখার ছিল, নিজের দেশটাও ভালভাবে দেখা হল না।" অন্যজন বলেন, "আমার কত জানার ছিল, কিছুই জানা হল না।"

অফিসের মতোই সংসারের ব্যাপারেও যদুবাবু-মধুবাবু সমান বীতশ্রদ্ধ।

"রোগ-অসুখ, ছেলের চাকরি, বাড়ি প্লাস্টার...যদু, আর ভাল লাগে না!"

"জলের ট্যাক্স, কর্পোরেশন, পাঁচিল নিয়ে পড়শির সঙ্গে গোলমাল...মধু, আর ভাল লাগে না!"

"একটা প্রবলেম যায় তো আর-একটা আসে, উঃ!"

"দেখলাম চাঁদ উঠল, কিন্তু না, আবার কৃষ্ণপক্ষ, উঃ!"

তবু যদু ও মধুবাবু তাঁদের না-ভাললাগা নিয়েই অবসরকাল পর্যন্ত নিয়ম মাফিক অফিস ও সংসার দুটোই করে গেলেন। একদিনও অফিসের কাজে ফাঁকি দেননি, একদিনও সংসারের ব্যাপারে অবহেলা করেননি। দু'জনেই বলতেন, "দাঁড়াও বন্ধু, রিটায়ার করি, তখন আমরা পরো স্বাধীন। তখন নো অফিস, নো সংসার!"

যদুবাবু বলেন, "শোন মধু, রিটায়ার করার পর আমরা সকাল-বিকাল পার্কে চলে আসব। গোটা পার্ক চক্কর দেব। আচ্ছা বল তো শীতকালে আমাদের পার্কের কোন বেঞ্চটায় আগে রোদ লাগে?"

"পুবের বেঞ্চে।"

"পুবেও তো চারটে বেঞ্চ! তুই বলতে পারবি না, আমিও পারব না। আমাদের সব খুঁটিয়ে দেখতে হবে!"

মধুবাবু বলেন, "কোন বেঞ্চ থেকে সবশেষে আলো যায়? পশ্চিম দিকের বেঞ্চ, কিন্তু সেখানেও তো চারটে বেঞ্চ!"

দু'জনেই হাহা করে হেসে ওঠেন। তাঁরা দু'জনেই ঠিক করেন পার্কের রিটায়ার্ড ম্যানদের নিয়ে তাঁরা একটা ক্লাব করবেন। সেখানে বাৎসরিক অনুষ্ঠান হবে, গান, নাটক, স্পোর্টস্, অবসরপ্রাপ্ত লোকেদের দৌড় প্রতিযোগিতা।

ছাপ্পান্ন বছর বয়স থেকেই দু'জনে ক্লাবের নাম ঠিক করতে লেগে যান। যদুবাবু একদিন এসে বললেন, "মধু, আমরা আমাদের ক্লাবের নাম দেব 'অবসারিকা'।" পরের দিন মধুবাবু এসে বলেন, "যদু, আমার ছোট মেয়ে গতকাল সন্ধেবেলা কার একটা পদ্য পড়ছিল, সেখান থেকে আমি একটা নাম পেয়ে গেছি আমাদের ক্লাবের, দারুণ নাম 'আবার আসিব ফিরে'।"

দিন-দুই পর যদুবাবু নাম বদলে রাখলেন 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি'।

এমনকী দু'জনে মিলে 'সারাংশ' নামটাও ঠিক করে ফেলেছিলেন

শব্দসন্ধান

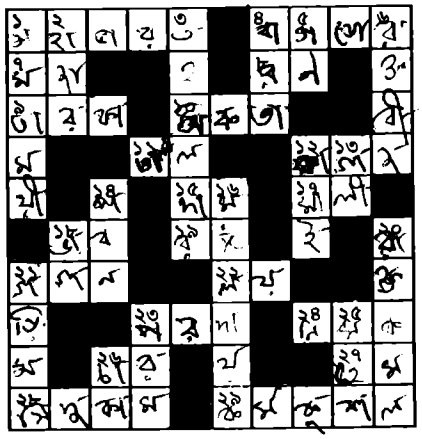

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) বেদব্যাসের লেখা বিখ্যাত বিশাল কাব্য। (৪) ঘোড়ার মুখের লাগাম। (৭) কৌতুক। (৮) সংগ্রাম। (৯) হাউই বলে, এর মুখে সে ছাই দিয়ে আসে। (১০) বালুকা। (১১) — নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার। (১২) যা না থাকলে বই লেখা বন্ধ। (১৫) মূল্য। (১৭) বাগানের কাজ এই লোকই করেন। (১৮) আড়ির উলটো। (১৯) 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা।' (২১) আকাশ। (২২) বিনাশ। (২৩) মিথ্যাবাদীর চোখের— নেই। (২৪) লবণ। (২৬) দুয়ে-দুয়ে যা হয়। (২৭) সোনা। (২৮) যার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। (২৯) কাজকর্মে পটু।

উপর-নীচ : (১) স্নেহময়ী। (২) '—লোকে মেলাটিরে করেছে করুণ।' (৩) খাজনা আদায়কারী। (৪) 'আজ কি তাহার—পেল রে কিশলয়।' (৫) সমষ্টি। (৬) এই অসুরের একফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লেই এক নতুন অসুর জন্মাত। (১২) কাজও নেই,—ও নেই। (১৩) 'অলি—চলি রাম, ফুটপাথে ধুমধাম।' (১৪) হনুমানের পিতা। (১৬) মঙ্গলকর। (১৮) অংশ। (২০) লাল পদ্ম। (২১) দীর্ঘসূত্রতা। (২৩) শ্রেষ্ঠ, প্রধান। (২৫) শিব। (২৬) রথের এই অংশটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে মাটিতে বসে গিয়ে কর্ণের সর্বনাশ করেছিল।

গত সংখ্যার সমাধান

দে	ব	ব্র	ত	■	ন	র	ম	■	ফু
বা	ড়ি	■	প	দ	ক	■	হা	ত	ল
দি	■	উ	■	ফা	ল	■	জ	ল	দ
দে	বো	প	ম	■	■	জ	ন	ব	ল
ব	■	ল	য়	■	জা	ম	■	■	■
■	■	■	দা	রু	■	কা	না	■	দ
আ	চ	ম	ন	■	■	লো	কা	চা	র
শ	ম্ব	র	■	পা	খা	■	ল	■	দ
পা	ল	ক	■	তা	বি	জ	■	বা	স্তু
শ	■	ত	র	ল	■	জ	র	জ	র

দেবসেনাপতি

একবার।

কিন্তু অবসর গ্রহণের পর বড়জোর বার-দুই এসেছিলেন পার্কে, এতেই পার্কের লোকজন, পরিপার্শ্ব সব কৃত্রিম মনে হল তাঁদের। সেই একই তাসখেলা, একই চা-ওলা, বাদামওলা, গোবিন্দবাবু-নস্করবাবু সেই একই পুরনো গল্প, হয় অফিসের না-হয় সংসারের। কারও বউমার হাতে তৈরি চিংড়ির মালাইকারি নিয়ে গল্প, কারও নাতি-নাতনির বায়না নিয়ে।

যদুবাবু জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা মধু, ষাট বছর হলে কি মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায় ?"

মধুবাবু বলেন, "হ্যাঁ, তা তো হয়ই, সেজন্যই তো রিটায়ারমেন্ট।"

"কিন্তু আমাদের বয়স তো বাষট্টি হয়ে গেল, তবু আমরা বৃদ্ধ হলাম না কেন বল তো ? কেন আমরা গোবিন্দবাবু-নস্করবাবুর মতো অফিসের পুরনো স্মৃতি নিয়ে, নাতি-নাতনি, চিংড়ির মালাইকারি নিয়ে মশগুল থাকতে পারছি না ? কেন আমাদের গায়ে এত জোর, কেন আমাদের এখনও হজমের গন্ডগোল হচ্ছে না, কেন অমাবস্যা-পূর্ণিমায় হাঁটু কনকন করে না ? কেন আমরা এখনও দু'জন একজায়গায় বসলে ম্যাপ দেখি, কোথাও-না-কোথাও বেরিয়ে পড়ার জন্য মনে-মনে ছটফট করি ? কেন আমরা জানতে চাই, দেখতে চাই, কিছু করতে চাই ?"

দু'জনে নির্বাক হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন, একসময় মধুবাবু যদুবাবুর হাত ধরে বললেন, "যদু, আমরা রিটায়ার করার পরও কিন্তু দু' বছর সময় অযথা নষ্ট করে ফেলেছি, এর পর কিন্তু পস্তাতে হবে, চল বেরিয়ে পড়ি।"

"তা হলে কবে, কখন, কোথায় যাব সব ঠিক কর !"

"আমরা শুধু জানি যেতে হবে, আর তো কিছু জানি না, এখানে আমাদের ভাল লাগছে না, ব্যস ! আমরা এখন চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলেও কারও কিছু এসে যায় না, আমাদের যা কর্তব্য, যা করণীয় তা করে দিয়েছি, বাকি জীবনটুকু আমাদের। যাওয়ার আগে শুধু একটা নোট রেখে যেতে হবে আমাদের, 'স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, সমাজ, বন্ধুবান্ধব প্রমুখ সকলের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, আমি সুস্থ ও স্বইচ্ছায় বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি। আমার কারও ওপর কোনও ক্ষোভ বা দুঃখ নেই, বরং সকলের কাছ থেকে যে সহযোগিতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা পেয়েছি সেজন্য আমি ধন্য। আমার খোঁজে পুলিশ, টিভি-রেডিয়ো ইত্যাদিতে টাকা খরচ কোরো না, যাওয়ার সময় সকলের কাছে আমার শুধু এইটুকু অনুরোধ। ইতি মধুসূদন চক্রবর্তী।"

যদুবাবু বললেন, "মধু, তোর এই নোটটার একটা জেরক্স কপি আমাকে দে, আমি আবার বাংলা রচনা, ভাবসম্প্রসারণ ভাল লিখতে পারতাম না, আমার সুবিধে হবে !"

দু'জনেই হাসতে-হাসতে হাত ধরাধরি করে বেরোলেন পার্ক থেকে।

"তা হলে কবে যাচ্ছি আমরা ?"

"তোর নাতির স্কুল-অ্যাডমিশন কবে যেন ?"

"আমার নাতির পর তোর নাতনির পালা !"

"চার তারিখ জন্মাষ্টমী !"

"সোমে যম, বেরোতে নেই !"

পার্কের গেট খুলে বেরিয়েই দু' বন্ধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটারদের মতো, তাঁরা উল্লাস এলেই যেমন হাতে-হাতে ঠোকা দেন, তেমনই দু'জনে তালুতে চটাস শব্দ তুললেন, "আমরা নতুন পথের যাত্রী, আগামীকাল ভোরেই আমাদের যাত্রা। ভোর সাড়ে চারটেয় হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির নীচে আমাদের দেখা হবে !"

হঠাৎ যদুবাবু গান ধরলেন, "চল রে চল রে চল, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরণীতল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল রে চল রে চল।"

দেখা গেল ভোর সাড়ে চারটেয় যদুবাবু ও মধুবাবু হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির নীচে। এ-বয়সেও কারও একমিনিট এদিক ওদিক হয়নি।

॥ ২ ॥

যদুবাবু বললেন, "মধু, যা টিকিট কেটে নিয়ে আয়।"

"কোথাকার ?"

"যেখানকার টিকিট পাবি সেখানকার, তবে যত দূর আর দুর্গম হয় ততই ভাল। আমরা হতে চাই নতুন দেশের অতিথি।"

দুজনেই হাসলেন।

টিকিট কেটে নিয়ে এলেন মধুবাবু।

টিকিট দেখে যদুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কি ফিল্মে নামবি নাকি রে মধু ?"

"ফিল্মে ?"

"আমরা পশ্চিমের দিকে যাচ্ছি তো, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

"মাঝপথে কোথাও নেমে পড়ব ! বোম্বাই থেকেও অনেক জায়গায় যাওয়া যায়—কোলহাপুর, মিরাজ, মারমাগাঁও...। চল, আপাতত এক কাপ করে চা খাই, ট্রেন ছাড়তে মিনিট-কুড়ি দেরি আছে।"

যদুবাবু বললেন, "তবে জানলার ধারে সিট পেলে ভাল হয়। রানিং ট্রেন থেকে অনেক কিছু দেখা যায়। দেখতে পাবি ছাগল-মা দুই বাচ্চা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে রাস্তার ওপরে, আর ডুরে শাড়ি-পরা বাচ্চা মেয়ে তার সখির সঙ্গে আমের কুশি খেতে-খেতে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। আমাদের মতো ওদেরও বড় সাধ অজানা জগৎ সম্পর্কে, ট্রেনে চড়ে বহু দূর-দূর চলে যেতে ওরাও চায় ! কিন্তু সকলের তো সাধ্যে কুলোয় না। ট্রেনে তো ভাড়া লাগে, কেন যে ট্রেনে ভাড়া লাগে, শুধু ভাড়া লাগে বলেই দিনের পর দিন ওরা ট্রেন দেখেই যায়, ট্রেনে চড়তে পারে না। ট্রেন চলে গেলেই দুই সখি ফিরে এসে ছাগল বাচ্চার ঘুম ভাঙায়, দুজনে কোলে তুলে নেয় দুই বাচ্চাকে। এভাবেই ওরা ট্রেনের কথা ভুলে যায়, অজানার কথা ভুলে যায়। আমরা যে ট্রেন থেকে অত হাত নাড়লাম, তাও ভুলে যাবে।"

ট্রেন ছাড়ল। ছাড়ার আগেই আধঘন্টা লেট। তাঁরা চাইছিলেন যত তাড়াতাড়ি ট্রেন ছাড়ে, তারপর লেট করুক। অবশ্য এই ফাঁকে তাঁরা দুটো নিম দাঁতন কিনে নিয়েছেন।

নাঃ, জানলার ধারে সিট পাননি যদুবাবু-মধুবাবু। কোনওরকমে বসার জায়গাটুকু। এতেই তাঁরা খুশি। যদুবাবু জিজ্ঞেস করেন, "কী রে মধু,

"আমি সুস্থ ও স্ব-ইচ্ছায় বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি। আমার কোনও ক্ষোভ বা দুঃখ নেই, বরং সকলের কাছ থেকে যে সহযোগিতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা পেয়েছি সেজন্য আমি ধন্য। আমার খোঁজে পুলিশ, টিভি-রেডিয়ো ইত্যাদিতে টাকা খরচ কোরো না, যাওয়ার সময় সকলের কাছে আমার শুধু এইটুকু অনুরোধ। ইতি মধুসূদন চক্রবর্তী।"

যদুবাবু বললেন, "আমাদের কিন্তু একটু লুকিয়ে-লুকিয়ে থাকা দরকার। বলা যায় না, তোর বাড়ির লোকজন গেল শিয়ালদা স্টেশনে, আমার বাড়ির লোকজন চলে এল হাওড়া স্টেশনে। এই দুটো স্টেশন ঘিরে ফেললে কলকাতার লোকের আর পালানোর জায়গা নেই।"

মধুবাবু বলেন, "যদু, আমরা কিন্তু পালাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি, বয়স হয়েছে মনে করে ছেলেমেয়েরা পাছে না ছাড়ে সেজন্যই শুধু আগেভাগে ওদের বলিনি। যারা পালায় তাদের চোখমুখ অন্যরকম হয়ে যায়, কিন্তু আমার মুখ দ্যাখ একেবারে স্বাভাবিক।"

যদুবাবু সঙ্গে-সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, "আমার মুখ ?"

"স্বাভাবিক, একেবারে স্বাভাবিক।"

দু'জনেরই হাসির চোটে চায়ের কাপ উছলে ওঠে।

যদুবাবু চা খেতে-খেতে বললেন, "জানিস মধু, স্টেশনের চা, বিশেষ করে হাওড়া স্টেশনের চা আমি কোনওদিন মুখে দিতে পারি না। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমি এর আলাদা স্বাদ পাচ্ছি। হাওড়া স্টেশনের চায়ে আলাদা গন্ধ আছে, আমি এতদিন ধরতে পারিনি।"

মধুবাবু এক ডজন কলা আর একটা বড় পাউরুটি কিনে নিলেন। বললেন, "ট্রেনে উঠে কলা-পাউরুটি সহযোগে মোটা টিফিন করব, তারপর ঘুম। চলুক ট্রেন, যেমন খুশি। আমাদের ভারতবর্ষের ট্রেন নাকি অসম্ভব লেট করে, তা কর তো বাপু কত লেট করবি, আমাদের নিয়ে লেটের একটা রেকর্ড কর তো, আর যে যাই বলুক, আমরা দু' বন্ধু আজ তোকে প্রাণ খুলে সাধুবাদ জানাব !"

তোর কষ্ট হবে না তো, বসে-বসে ঘুমোতে পারবি ? শেষের দিকে তোর আবার প্রমোশন হয়েছিল, ফার্স্টক্লাস ছাড়া ট্রেনে চড়তিস না। অসুবিধে হলে বল চেকারকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে রিজার্ভেশন করে নিই !"

মধুবাবু বলেন, "আমি ভাবছি তোর কথা। তোর ছেলে কলকাতার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার, ডানলোপিলো গদিতে শোওয়াত বাবাকে, সেই তোকে আমি কিনা অতদূর বসিয়ে নিয়ে যাব !"

যদুবাবু বলেন, "এখন আমার কী মনে হচ্ছে জানিস, আমি দাঁড়িয়ে চলে যেতে পারি !"

মধুবাবু হাততালি দেন, "শাবাশ যদু, শাবাশ। নে, পাঁশকুড়া এসে গেছে। চপ কেন, পাঁশকুড়ার চপ খুব বিখ্যাত।"

"সে কী রে ! মেল এক্সপ্রেস তো সাধারণত পাঁশকুড়ায় দাঁড়ায় না !"

মধুবাবু হেসে ফেলেন।

"ভারতবর্ষের মানুষ আর ট্রেন এ-দুটোকে কিছুতেই নিয়মমাফিক কেউ চালাতে পারলেন না। কে যে কখন কোথায় দাঁড়িয়ে পড়বে কেউ জানে না। এ-দেশের মানুষ ও ট্রেন দুইয়েরই মহা অনিশ্চিত যাত্রা।"

যদুবাবু চপ-মুড়ি নিয়ে এলেন। দুটো ঠোঙা। প্রতিটি ঠোঙায় একটা করে লাল-টুকটুকে লঙ্কা। মধুবাবু তো ভারী উচ্ছ্বসিত হন লঙ্কা দেখে। তিনি আদর করে লঙ্কাটাই গালে বুলোতে লাগলেন, বললেন, "জানিস, আমার ঠাকুমা ছড়া বলতেন, 'এতটুকু ডালে/ লাল বউটি ঝোলে'।"

দুজনেই হাসলেন মুড়ি খেতে-খেতে।

কবিতা

সেই বয়সটা

গৌতম হাজরা

সেই বয়সটা ঝিলমিল রোদ
শিশিরভেজা ঘাসে
সেই বয়সটা জ্যোৎস্না-সাদা
বাগান জুড়ে হাসে।
সেই বয়সটা কোয়েল দোয়েল
মিষ্টি সুরের শিস্
সেই বয়সটা ধাঁই কুড়কুড়
বাতাসে ফিস্‌ফিস।
সেই বয়সটা তারার আলো
শিউলি ফোটা গান,
সেই বয়সটা রঙে রঙিন
পুলকে আনচান।
সেই বয়সটা বন-পাহাড়ে
নদীর বাঁকে বাঁকে
সেই বয়সটা রং তুলিতে
মনের ছবি আঁকে।
সেই বয়সটা সোনার বরন
লাগামছাড়া ঘোড়া
সেই বয়সটা রঙবাহারি
মিষ্টি ফুলের তোড়া।
সেই বয়সটা নীল আকাশে
নতুন দিনের খাম
সেই বয়সটা বুকের ভেতর
লুকিয়ে রাখলাম।

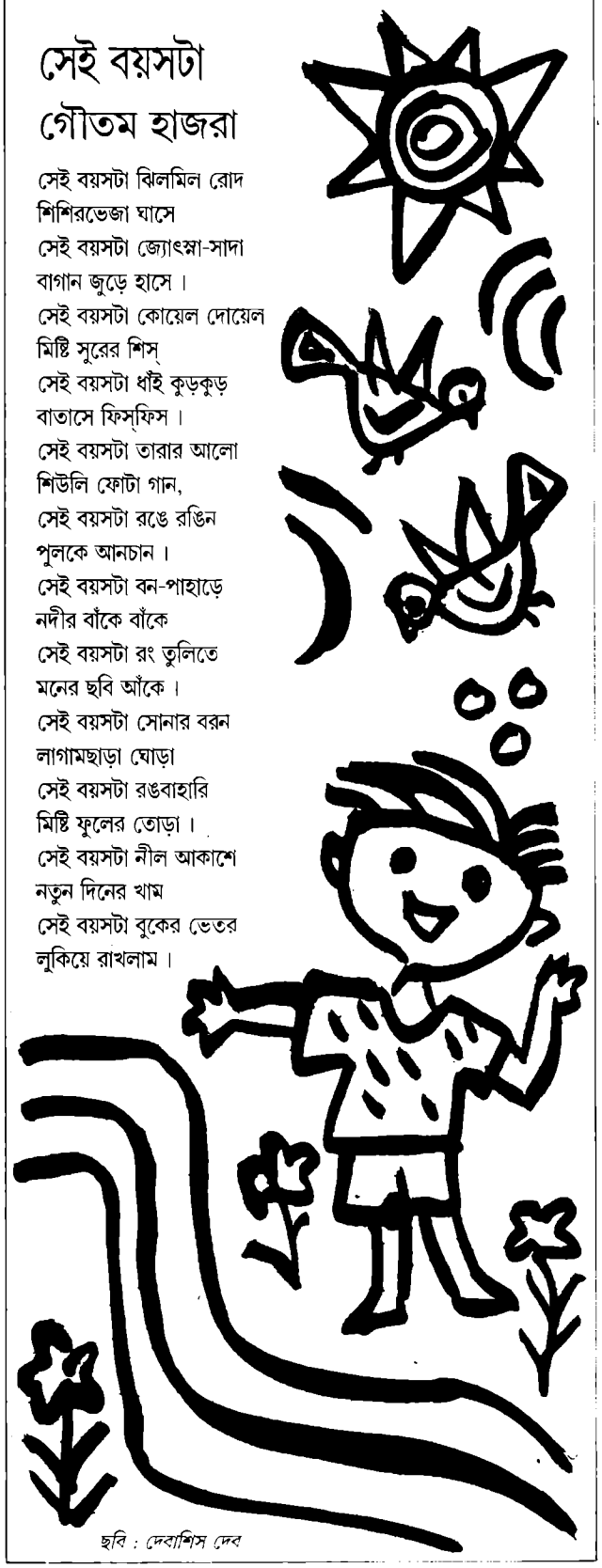

ছবি : দেবাশিস দেব

মধুবাবু বললেন, "না, না আমি একটার বেশি চপ কিছুতেই খাব না, তুই এত চপ নিতে গেলি কেন ?"

যদুবাবু বলেন, "আরে, খা খা !"

"খা বললেই হল ! দ্যাখ, আমরা বাইরে বেরিয়েছি, আর ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের বয়স সিক্সটি টু।"

যদুবাবু হাঁ করে চপ কামড় দিতে গিয়েও মুখের কাছ থেকে হাতটা সরিয়ে নেন, বলেন, "কী জানিস মধু, আজ মনে হচ্ছে আমাদের বয়সের সংখ্যাটা উলটে গেছে।"

"মানে ?"

"সিক্সটি টু-কে উলটে দ্যাখ !"

"টুয়েন্টি সিক্স !"

"আমার মনে হচ্ছে আমরা এখন ছাব্বিশ বছরের যুবক ! কী, তোর মনে হচ্ছে না ?"

"ছাব্বিশ কি না জানি না, তবে বেশ কম বয়স, কম বয়স লাগছে।"

"উঃ !"

"কী হল !"

মধুবাবু বলেন, "আরে, লঙ্কা চিবিয়ে দিয়েছি। বাব্বাঃ, এ-লঙ্কা শুধু দেখনদারি নয়, এর গুণও আছে !"

যদুবাবু বলেন, "আমাদের কলকাতার লঙ্কায় কিন্তু বাপু এত ঝাল চলে না, সেখানে সবকিছু মেপে চালান যায়। বেশি ঝাল চলবে না, বেশি টক চলবে না, এখন তো আবার কম তেতোর নিমপাতা পর্যন্ত বেরিয়েছে।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ রে, গড়িয়া মার্কেট থেকে সেদিন নিমপাতা আনলাম, তেতো নেই বললেই চলে ! কলকাতার মানুষের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তৈরি হচ্ছে সবকিছু। কলকাতার মানুষজনকে দেখবি বেশি রাগে না, বেশি খায় না, বেশি ঘুমোয় না। কিন্তু পাঁশকুড়ার লোকের তো সবকিছু বেশি-বেশি চাই, লঙ্কায় ঝাল না হলে সেই গাছটাই খেত থেকে তুলে দেবে লোকে। টিকে থাকার জন্য এখানকার লঙ্কাকেও বেশি ঝাল আহরণ করতে হয়েছে।"

যদুবাবু, মধুবাবুর ঝাললাগা দেখে বললেন, "আমাদের সঙ্গে একটা জলের বোতল থাকা উচিত ছিল !"

মধুবাবু হু-হা করতে-করতেও রেগে উঠলেন, "এর পর বলবি একসেট বিছানা থাকলে ভাল হত, ইশ, দু-চারখানা বই নিয়ে যদি বেরোতাম তা হলে সময় কাটাতে একদম অসুবিধে হত না, কিংবা ট্রানজিস্টারটা ! আমরা বেড়াতে যাচ্ছি না, বুঝলি, আমরা চলেছি আত্ম-অন্বেষণে !"

যদুবাবু ফিসফিস করে বলেন, "আস্তে বল !"

মধুবাবু ফিসফিস করে বলেন, "তাই তো, আত্ম অন্বেষণ বললাম। বাঙালি সহযাত্রীরাও ইংরেজিতে অনুবাদ না করে শব্দটার অর্থ চট করে ধরতে পারবেন না !"

দু'জনে মনের আনন্দে চপ-মুড়ি চিবোতে-চিবোতে হাসতে থাকেন।

"এই যে ! তোমরা কেবল দু'জনে কথা বলো, দু'জনে হাসো, কেন !"

"অ্যাঁ !"

যদুবাবু-মধুবাবু দু'জনেই চমকে ওঠেন ! তাঁরা দেখেন দশ-বারো বছরের ভাই-বোন আঙুল উঁচিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে।

বোন যদুবাবুকে তর্জনী নেড়ে বলে, "এদিকে উঠে এসো, উঠে এসো বলছি !"

ভাই অনুরূপ তর্জনী নেড়ে মধুবাবুকে বলে, "ইউ, হ্যাঁ তোমাকে বলছি, তুমিও উঠে এসো !"

দু'জনেই সুড়সুড় করে উঠে দাঁড়ান।

"নিজেদের মধ্যে অত কথা কী ? আমরা খেলার লোক পাচ্ছি না,

তোমরা আমাদের সঙ্গে খেলবে এসো।"

ভাই বলে, "শোনো, সবাই হেরে গেছে আমাদের কাছে, আমরা তোমাদের হারিয়ে কম্পার্টমেন্ট বিজয়ী হতে চাই !"

মধুবাবু হেসে বলেন, "আমরা পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছি দিগ্বিজয় !"

"না, তা হলে হবে না, এখানে বশ্যতা স্বীকারের কোনও ব্যাপার নেই ! লড়াই না করে যে বশ্যতা স্বীকার করে সে কাপুরুষ !"

"আমরা প্রশ্ন করছি, তোমরা উত্তর দেবে, তোমরা প্রশ্ন করবে, আমরা উত্তর দেব। পরপর তিনটে প্রশ্নের উত্তর যে পক্ষ দিতে পারবে না তারা আউট, কী, ঠিক আছে !"

বোন বলল, "আর আমাদের জাজ হলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত ল'ইয়ার মিস্টার এইচ. এন. রায়, হীরেন্দ্রনাথ রায়।"

মিস্টার এইচ.এন. রায় এদের বাবা।

মধুবাবু হেসে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি তো কুইজের বাবা !"

হীরেন্দ্রবাবু হেসে ওঠেন, বলেন, "দেখুন তো এদের কান্ড !"

বোন বলে, "নাও, স্টার্ট। সময় কিন্তু এক মিনিট।"

ভাই প্রশ্ন করে, "সোনার ঘনত্ব কত ?"

যদুবাবু-মধুবাবু দু' জনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, "পাস !"

" ..... রানিং ট্রেন থেকে অনেক কিছু দেখা যায়। দেখতে পাবি ছাগল-মা দুই বাচ্চা নিয়ে ঘুমিয়ে আছে রাস্তার ওপরে, আর ডুরে শাড়ি-পরা বাচ্চা মেয়ে তার সখির সঙ্গে আমের কুশি খেতে-খেতে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। আমাদের মতো ওদেরও বড় সাধ অজানা জগৎ সম্পর্কে, ট্রেনে চড়ে বহু দূর-দূর চলে যেতে ওরাও চায়.... !"

"নাও, এবার তোমরা প্রশ্ন করো !"

হীরেন্দ্রবাবু বললেন, "তোমরা উত্তরটা কাকুদের বলে দাও !"

ভাই বলে, "উনিশ সি সি।"

যদুবাবু প্রশ্ন করলেন, ইচ্ছে নেই কোনও কঠিন প্রশ্ন করার, বাচ্চা দুটো ছেলেমেয়েকে হারিয়ে আমরা কি ভীষণ তৃপ্ত বোধ করব, তার চেয়ে ওরা যদি খুশি হয় হোক না ! আর ওদের বাবা, মা, আত্মীয়রা এই নিয়ে যদি গর্ব করেন, করুন ! তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও জিজ্ঞেস করেন, "বলো তো জলকে জীবন বলে কেন ?"

সকলে হেসে ওঠে হো হো করে। ভাই বলে, "এ তো ওয়ানের সায়েন্সের বইতে আছে, তুমি আমাদের এসব জিজ্ঞেস করছ !"

ওদের মা বললেন, "আপনারা আরও কঠিন প্রশ্ন করুন, এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেক অ্যাডভান্স !"

মধুবাবু জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা বলো, রক্ত শরীর থেকে বাইরে বেরোলে তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধে কেন ?"

বোন রেগে যায়, "যাও, তোমাদের প্রশ্নের উত্তরই দেব না, রক্ত জমাট বাঁধে কেন ? যখনই কেটে গিয়ে রক্তপাত ঘটে তখনই ওই কাটা এবং ভাঙা অনুচক্রিকা থেকে থ্রম্বোপ্লাসটিন নিঃসৃত হতে থাকে। এই থ্রম্বোপ্লাসটিন রক্তের প্রোথ্রমবিন ও ক্যালসিয়াম আয়নকে থ্রমবিনে পরিণত করে। থ্রমবিন রক্তের ফাইব্রিনোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফাইব্রিনে পরিণত হয়। ফাইব্রিন ঘন জালকের আকারে রক্তকণিকাগুলিকে আবদ্ধ করে, ফলে রক্ত জমাট বেঁধে যায়।"

যদুবাবু-মধুবাবু হাততালি দেন।

এরকম বেশ উপভোগ্যই ছিল তাঁদের ভ্রমণ। কিন্তু বিপদ ঘটল বিলাসপুর-নাগপুরের মাঝামাঝি, সেদিন রাত্রিবেলা একদল ডাকাত উঠল ট্রেন ডাকাতি করতে। তাঁদের কম্পার্টমেন্টে, পিস্তলধারী দু'জন, মুখে কালো কাপড়বাঁধা, মাথায় কালো ফেট্টি।

গোলমাল শুনে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগে আগুন লেগেছিল, সেই ভয় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সারা ট্রেনে। হইচই, গোলমাল, এরই ফাঁকে ডাকাতদল চারটে কম্পার্টমেন্ট থেকে যার যা ছিল সব নিয়ে চম্পট দেয়। যদুবাবু-মধুবাবু ডাকাতদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, মারা গেলে তাঁদের কোনও ক্ষতি নেই, তাঁরা মনেপ্রাণে চাইলেন ধরা পড়ুক ডাকাতদল। তাঁরা ভুলে গেছেন তাঁদের বাষট্টি বছর বয়স, তাঁরা ছাব্বিশের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়লেন ডাকাতদের ওপর। কিন্তু সাহস করে কম্পার্টমেন্টের আর কেউই এগিয়ে এল না, ফলে তাঁদের কাছে টাকা-পয়সা যা ছিল সবই তো গেলই, উপরন্তু বেধড়ক পিটুনি খেলেন ডাকাতদের নৃশংস হাতে। ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচে নামিয়ে দিল তাঁদের।

এদিকে ড্রাইভার যখন বুঝতে পারলেন যে আগুন নয়, ট্রেনে ডাকাত পড়েছে তখন আর বিলম্ব না করে ট্রেন ছেড়ে দিলেন। ডাকাতের ভয়ে অন্যান্য কম্পার্টমেন্টের দরজাও বন্ধ ছিল, তাঁরা উঠতে পারলেন না, ট্রেন চলে গেল।

প্রচণ্ড অন্ধকার। চারদিকে ঘন জঙ্গলের জন্য এই অন্ধকার আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। তাঁরা এখন কী করবেন, কোনদিকে যাবেন বুঝতে পারছেন না।

মধুবাবু বললেন, "যদু, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তো কোনও লাভ হবে না, এটা তো স্টেশন নয় যে ট্রেন দাঁড়াবে, হয় আমাদের সামনের দিকে যেতে হবে, না হয় পেছনের দিকে।"

যদুবাবু বলেন, "স্টেশনে গিয়ে কী হবে, আমাদের কাছে আর টাকাও নেই, টিকিটও নেই ! তার চেয়ে চল ডাইনে কিংবা বাঁয়ে।"

"ওদিকে গেলে কী পাওয়া যাবে, শুধুই তো জঙ্গল ?"

"আমাদের আবার পাওয়া, না-পাওয়া। ভালই হয়েছে, যেটুকু সম্বল ছিল চলে গেছে। আমরা যেটুকু টাকা এনেছিলাম এতে তো আর বাকি জীবন চলত না, বেঁচে থাকার জন্য কিছু-না-কিছু করতেই হত। সেটা আমরা এখন থেকেই শুরু করে দিতে পারব !"

"এত ঘন জঙ্গল, বাঘ-ভালুক থাকা বিচিত্র নয়। শেষপর্যন্ত বাঘের পেটে জীবনটা যাবে।"

"ভারতবর্ষের ক'টা জঙ্গলে বাঘ-ভালুক আছে রে ? আর থাকলেও তারা এখন আর মানুষের চেয়ে বেশি হিংস্র নয়। চল, যা হওয়ার তা হবে !"

দু'বন্ধু জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে শুরু করলেন।

দেখতে-দেখতে সকাল হয়, সকাল পেরিয়ে দুপুর, আবার বিকেল গড়িয়ে সন্ধে, সন্ধে মিলিয়ে গিয়ে ঘন রাত নেমে আসে। এভাবেই তাঁদের পনেরো দিন কেটে গেল জঙ্গলে। নিঃস্ব মানুষের কাছে জঙ্গলের চেয়ে বড় বন্ধু আর নেই। তাই আদিম মানুষ বাঁচার জন্য জঙ্গলই বেছে নিয়েছিলেন। খাদ্য এবং আত্মরক্ষা এই দুই কাজেই জঙ্গল সাহায্য করেছে মানুষকে যুগ-যুগ ধরে।

যদুবাবু-মধুবাবুও এখন একেবারে সেই আদিম মানুষের মতো। গাছের ফল খাচ্ছেন, ঝরনার জল খাচ্ছেন, আর অন্ধকার নামলেই বড় উঁচু গাছ দেখে দু' বন্ধু দুটো ডাল বেছে নিয়ে...একটা ডাল বিছানা করলেন তো একটা ডাল বালিশ। বেশি উঁচু ডাল হলে পড়ে যাওয়ার ভয়ে ডালের সঙ্গে বেঁধে নেন নিজেদের।

জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার কোনও চোখে পড়েনি তাঁদের। বাঘ-ভালুক দরকার নেই, একদল হাতি, একপাল হরিণ, নিদেনপক্ষে কিছু হনুমান থাকলেও জঙ্গলের শোভা বাড়ত। তবে অজস্র কীটপতঙ্গ, অজস্র পাখি। কতরকমের যে পাখি দেখছেন সারাদিন ! পাখির ডাকে এখন রোজ তাঁদের ঘুম ভাঙে।

গাছের ডালে বাঁধা অবস্থায় মধুবাবু জিজ্ঞেস করেন, "যদু, ঘুমোলি ?"

"না ! কী, বল ?"

"ভাত খাইনি কদ্দিন হল রে যদু ?"

"অন্নপ্রাশনের পর থেকে তো ভাত গিলছিস বাষট্টি বছর পর্যন্ত, বাকি ক'টা দিন আর নাই-বা খেলি !"

"ফলমূল যতই সুমিষ্ট হোক, আমাদের মাছ-ভাতের তুলনা হয় না, ও তুই যাই বল !"

"এর পর পিঠে-পায়েসের কথা তুলবি না তো ?"

"জানিস এরকম আম পেলে আকাশের মা এক্ষুনি আমচুর বানাতে বসে যেত !"

যদুবাবু রেগে বলেন, "মধু, তুই কিন্তু ক'দিন ধরে খুব বাড়াবাড়ি করছিস, কেবল পেছনে ফিরে যাচ্ছিস, সংসারের কথা বলছিস !"

মধুবাবু বলেন, "দ্যাখ যদু, তুইও কিন্তু সেদিন তোর নাতির কথা বলেছিলি ! বলেছিলি নাতির জন্য তার বাবা একটা কাঠের ঘোড়া কিনে এনে দিয়েছে, সে সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে থাকে, আর দোল খায়। গাছের ডালে বসে তুই সেদিন তোর নাতির দোল খাওয়া দেখাসনি ? বল !"

যদুবাবু বলেন, "আমি যদি কখনও ভুল করে স্মৃতি রোমন্থন করি তুই বন্ধ করে দিবি !"

মধুবাবু বলেন, "আমি করলে তুই বন্ধ করে দিস !"

"নে, ঘুমো, গুড নাইট !"

"গুড নাইট !"

আবার সকাল হয়। দু'জনে হাঁটতে শুরু করেন সামনের জঙ্গল ভেদ করে। পেছনে পড়ে থাকে স্টেশন, ট্রেন, নাগপুর, কলকাতা।

কিন্তু একটা প্রশ্ন তাঁদের মনের মধ্যে থেকেই যায় !

যদুবাবু জিজ্ঞেস করেন, "এ-জঙ্গল কি কোনওদিন শেষ হবে না, হ্যাঁ রে মধু ?"

মধবাবু বলেন, "আর কতদিন পর দেখতে পাব জঙ্গলের ঈশ্বরকে !"

॥ ৩ ॥

মধুবাবু গাছে ওঠা খুব রপ্ত করে ফেলেছেন, তরতর করে মগডালে উঠে যেতে পারেন চোখের নিমেষে। যদুবাবু নীচের থেকে চেঁচান, "নেমে আয় মধু, নেমে আয় ! অত ওপরে ওঠার দরকার কী, জঙ্গল যখন—তখন শুধুই জঙ্গল, গাছ আর গাছ !"

হঠাৎ আজ মধুবাবু বললেন, "না বাপু, আজ জঙ্গলের ভেতর অন্য জিনিস দেখতে পাচ্ছি !"

"অন্য, কী অন্য ?"

"একটা প্রাসাদ দেখছি !"

"কী বলছিস ? ভাল করে দ্যাখ !"

"প্রাসাদ, তবে ভগ্ন প্রাসাদ, বুঝলি !"

"ভাঙা হোক যাই হোক তবু তো বাড়ি দেখলি, কতদিন আমরা বাড়িঘর দেখিনি বল তো ! তা হ্যাঁ রে মধু, মানুষজন কিংবা গোরু-বাছুর, গাড়ি-ঘোড়া...এসব কিছু দেখতে পাচ্ছিস না ?"

"না ! তা এখান থেকে তো অনেক, অনেক দূর, ভাল করে কিছু দেখাও যায় না !"

"হাতের চেটোকে চোঙের মতো গোল করে চোখে লাগিয়ে দ্যাখ, আমার দিকে তাকা, এরকম ! ইশ, আমি যদি তোর মতো গাছ বাইতে পারতাম রে মধু, তা হলে দু'জনে মিলে ঠিক কোনও-না-কোনও মানুষ আবিষ্কার করে ফেলতাম। প্রাসাদ আছে মানুষ নেই তাও কি আবার হয় !"

"জানিস যদু, এ ঠিক প্রাসাদ নয়, দুর্গ টাইপের, না ঠিক...।"

"দুর্গ না প্রাসাদ তুই বুঝতে পারছিস না ?"

"কী করে বুঝব, অফিস আর সংসার এর বাইরে তো বিশেষ বেরোইনি, কী দেখেছি কি জীবনে ?"

"আরে ছবি তো দেখেছিস ! আইডেন্টিফাই করতে পারছিস না !"

"কেমন ভৌতিক-ভৌতিক লাগছে !"

"ভূত !"

"কী দেখছিস সেটাই বল !"

মধুবাবু গাছের মগডালে বসে চেটোর দূরবিন দিয়ে দেখা ভগ্নপ্রাসাদ ও তার চারপাশের বিভিন্ন জায়গার বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন আর নীচে থেকে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন যদুবাবু।

"ডান দিকে বিশাল কালো জলের দিঘি।"

"দিঘিতে কী দেখছিস ?"

"কালো জল টলটল করছে !"

"আঃ, জলের রূপবর্ণনা করতে হবে না তোকে, কেউ জাল ফেলে মাছ ধরছে ?"

"না, শালুক আর পদ্ম ফুটে গোটা দিঘি ভরে আছে !"

"আমাদের শালুক-পদ্মে দরকার নেই ! কেউ বাসন মাজছে কি না দ্যাখ ?"

"না রে !"

"ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চোখ নিয়ে যা ! কী দেখছিস ?"

"এক আজানুলম্বিত ভুজ জটাধর বটগাছ !"

জটাধর বটগাছের বর্ণনায় যদুবাবুর গা একটু চমকে উঠল, তিনি তাড়াতাড়ি বলেন, "তোকে বটগাছের ভাবসম্প্রসারণ করতে হবে না, আরও বাঁয়ে, আরও বাঁয়ে চলে যা !"

দেখতে-দেখতে হঠাৎ মধুবাবু কী দেখলেন, অনেকক্ষণ ঘাড় সরালেন না, এমনকী যদুবাবু নীচে থেকে যে অত নির্দেশ পাঠাচ্ছেন তাও তিনি শুনছেন বলে মনে হচ্ছে না, একটা কথাও বলছেন না মধুবাবু, শুধু চেটোর দূরবিন দিয়ে দেখে যাচ্ছেন। এর পরই তরতর করে দ্রুত নীচে নেমে আসেন তিনি।

যদুবাবু সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, "কী হল, কী দেখলি ?"

মধুবাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, "চল যাই, দৌড়ে যাই !"

"কোথায় ?"

মধুবাবু যত খুলে বলছেন না, তত যদুবাবু রেগে উঠছেন।

"ওই প্রাসাদে। একটি কী সুন্দর বাচ্চা, মনে হচ্ছে ছোট রাজপুত্তুর...।"

"অবিকল তোর ছোট নাতির মতো !"

"ঠিক বলেছিস !"

"চুপ কর ! ছোট.ছেলেটা কী করছে বল ?"

"কাঁদছে রে ! ভাঙা ফটকের গায়ে ঠেস দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে !"

"বয়স কত ?"

"বললাম না, আমার ছোট নাতির মতো !"

"ছ'-সাত বছর !"

"জানিস যদু, আমার মনে হচ্ছে ছেলেটা খুব বিপদে পড়েছে !"

যদুবাবু জিজ্ঞেস করেন, "ঠিক দেখেছিস ? কোনও ভূতটুত...।"

"আরে না রে বাবা না, ছেলেটা ভাঙা লোহার গেটে ঠেস দিয়ে অঝোর নয়নে কেঁদে যাচ্ছে !"

"চল তা হলে, আর দেরি নয় !"

যদুবাবুই বললেন, "এভাবে গেলে হবে না, আমাদের দৌড়তে হবে।"

দু'জনে দৌড়তে লাগলেন। ওই ভগ্ন প্রাসাদ লক্ষ্য করে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

নানারকম

ধাঁধা

রেডিওতে প্রতিদিন সকালে দুটো অনুষ্ঠান শুনবেই ছোট্‌কা। একটি হল সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বাংলা খবরের অনুষ্ঠান, আর অন্যটি হল বাংলা খবরের, মানে স্থানীয় সংবাদের, ঠিক পরে-পরেই পনেরো মিনিট ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে-অনুষ্ঠান হয়, সেটি।

আসলে, এই সময়টায় ছোট্‌কা আয়না পেতে, দাড়ি-কাটার সাজ-সরঞ্জাম সামনে ছড়িয়ে দাড়ি-কাটার কাজটা সেরে ফেলে।

তো, গত শনিবারটা ছিল হঠাৎ-ছুটির দিন। ছোট্‌কাই বলে রেখেছিল— ওইদিন সকালে হানা দিয়ে ধাঁধা নিয়ে নিতে। কেননা, দশটা নাগাদ ছোট্‌কা দু'দিনের জন্য বাইরে যাবে— অফিসের কাজ নিয়ে।

আমি তাই সেদিন একটু আগেভাগেই চিলেকোঠার ঘরে হাজির হয়েছিলাম। রেডিওতে তখনও গান চলছে। শেষ গান যে, ঘোষকই সেটা জানিয়ে দিয়েছেন। গানটা হল, 'আমার আর হবে না দেরি' ! চমৎকার পুরুষকণ্ঠ। আমিও কথা না বলে শুনছি গানটা। ছোট্‌কার দাড়ি-কাটা শেষ, বাক্সে পুরে রাখছে সাজ-সরঞ্জামগুলো। আমাকে দেখেও কথা বলেনি। গান শেষ হতেই একগাল হেসে বলল, "সতুবাবুর দেরি হয় না। বিশেষ করে ধাঁধা নেওয়ার কথা থাকলে। কিন্তু, কী ধাঁধা দেব সতুবাবু ? আমার আর হবে না দেরি— চলবে, এই থিমে একটা নতুন ধাঁধা ?" বলেই খাতা খুলল ছোট্‌কা, ধাঁধা দিল। আর শুনে বুঝলাম, সত্যিই ধাঁধাটা আর দেরি না হওয়ার ব্যাপার নিয়েই তৈরি।

প্রথম ধাঁধা ॥ নতুন স্কুটার কিনেছেন ঘনশ্যামবাবু। তাঁর অফিসটা বাড়ি থেকে বেশ দূরে। আবার অফিসটায় পৌঁছনো নিয়ে বেশ কড়াকড়ি। ঠিক দশটায় পৌঁছতে হবে। দশটা মানে দশটা। ঘনশ্যামবাবু যে-রাস্তা দিয়ে অফিসে যাতায়াত করেন সেটা খুব মসৃণ, যানজট হয় না। কিন্তু সমস্যা হল সময় মানানো নিয়ে। ঘনশ্যামবাবু দেখলেন, আপের সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যদি ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালান, পৌঁছচ্ছেন সকাল ন'টায়, আর যদি ঘণ্টায় ২০ কিলোমিটার গতিবেগে যান, তা হলে পৌঁছচ্ছেন সকাল ১১টায়, অর্থাৎ এক ঘণ্টা দেরিতে।

ঘনশ্যামবাবু নিজের মতো ঠিক করে নিন, কীভাবে 'আর হবে না দেরি' অবস্থায় অফিসে পৌঁছবেন তিনি। কিন্তু এ থেকে তোমরা কি বলতে পারো, অফিসটা কতটা দূরত্বে আর কত কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালালে ঠিক দশটায় পৌঁছতে পারতেন তিনি ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ ঘড়ি এক হিসেবে লাজুক। কোন্ হিসেবে ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও— মাণমাদার

গতবারের উত্তর ॥ (১) ১৩ ঘণ্টা (৯+৩+১) জ্বলবে। (২) হিহিজল। (৩) মনসবদার।

সত্যসন্ধ

ভাবতে ভাবতে

পৃথিবীর যে ক'টি জিনিস সুন্দর, তার মধ্যে ফুল একটি ; তাই মানুষ ফুল ভীষণ ভালবাসে। শুধু ভালবাসেই না,

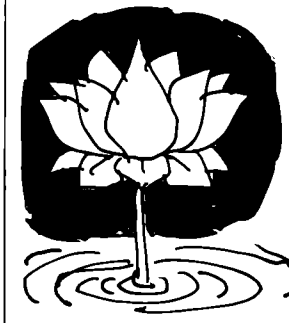

শিল্পী তাঁর তুলিতে, লেখক তাঁর কলমে ফুটিয়ে তুলেছেন কত না ফুলের ছবি, কত না ফুলের কথা। মানুষ ফুলকে তাই ভালবাসার স্বীকৃতি হিসেবে দিয়েছে মর্যাদা। আমরা ফুল নিয়ে জেনে নেব এবারে কিছু তথ্য। কোন-কোন দেশ কোন-কোন ফুলকে দিয়েছে জাতীয় ফুলের মর্যাদা—তা নিয়েই এবারের ভাবতে-ভাবতে।

১ ॥ ভারতের জাতীয় ফুল কী ?
২ ॥ হল্যান্ডের জাতীয় ফুল কী ?
৩ ॥ ফ্রান্সের জাতীয় ফুল কী ?
৪ ॥ বাংলাদেশের জাতীয় ফুল কী ?

উত্তর : (১) গোলাপ। (২) টিউলিপ। (৩) পদ্ম। (৪) শ্বেতপদ্ম।

বর্ণপ্রিয়

ছবি : দেবাশিস দেব

মজার খেলা

ছোটদের নিয়ে মজা করতে এ-খেলাটার তুলনা নেই। একজন বোকা বনবে, অন্যরা হেসে গড়াবে। খেলাটা কিন্তু খুব সহজ। কিন্তু ঠিকমতো দেখাতে পারলে খুবই হাসির। উপকরণ বলতেও তেমন কিছু নেই।

শুধু একটা দশ পয়সার মুদ্রা নাও। বেশ, খাঁজ-টাঁজ আছে এমন মুদ্রা। ঘষা পয়সায় তত জমবে না কিন্তু। নিয়েছ ?

বেশ, এবার এমন একজন ছোট্ট বন্ধুকে বেছে নাও, যে কিনা বেশ গোলগাল। অর্থাৎ গায়ে শুধু যার হাড় দেখা যাচ্ছে না, মাংসও রয়েছে। 'নাদুসনুদুস' যাকে বলে আর কী !

এবার তাকে তোমার হাতের দশ পয়সাটা দেখিয়ে বলো, "তোমার কপালে আমি এই পয়সাটাকে চেপে জোরে আটকে দেব। তুমি, হাত না দিয়ে, কেবল মাথাটা ঝাঁকিয়ে ফেলে দিতে পারবে পয়সাটা ? পারবে না, কিছুতেই পারবে না ! আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি।"

এই বলেই ছোট্ট বন্ধুটির কপালে মিনিটখানেক পয়সাটাকে সত্যি-সত্যি চেপে রাখো। এর পর আঙুলগুলোর জোরটা আলগোছে আলগা করে পয়সাটাকে তুলে নাও। তুমি যে পয়সাটা তুলে নিলে, দেখবে— বন্ধু সেটা টেরই পাবে না। তার মনে হবে, অনুভবও করবে সে, পয়সাটা সত্যি-সত্যি তার কপালে যেন আটকে রয়েছে।

আর তাই, তুমি যখন সরে এসে দাঁড়িয়েছ, সে, দেখবে, মাথা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে কেমন পয়সাটা ফেলার চেষ্টা করবে।

তার এই অকারণ চেষ্টা দেখে বাকি সকলেই তখন হেসে গড়িয়ে পড়বে। তাই দেখে একটু খেপে উঠবে বইকী ছোট্ট বন্ধুটি। এমনকী, হাত দিয়েও পয়সাটা এবার ছুঁতে চেষ্টা করতে পারে সে। আর তখন কী দেখবে ? পয়সা ?

কিন্তু পয়সা তো আগেই হাওয়া। এবার তোমার হাওয়া হয়ে যাওয়ার পালা !

মজারু

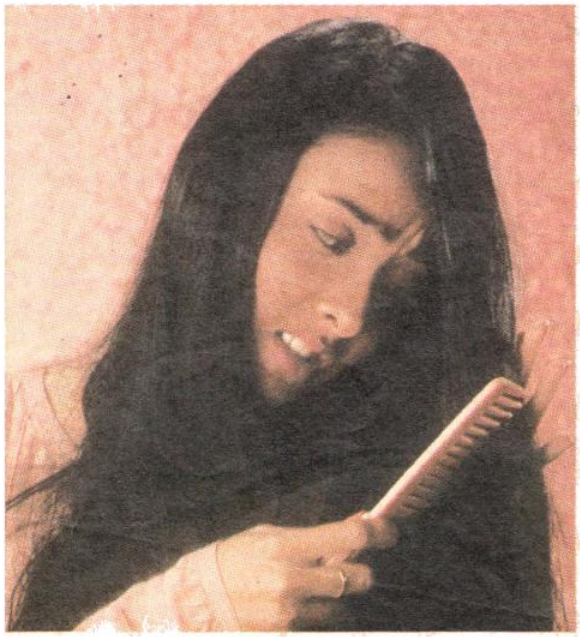

আপনার চুল কি এতই ক্ষুধার্ত যে সুন্দরই দেখায়না?

আপনার চুল যত্নের জন্য ক্ষুধার্ত কিনা তা বোঝার এক সোজা উপায় আছে। ধোবার পর একবার চুলটা আঁচড়ে নিন। যদি জট থাকে, বুঝবেন আপনার চুল দুর্বল হয়ে পড়েছে ও প্রকৃত যত্নের অভাবে উপবাসী রয়েছে।

এরকম ঘটে তার কারণ সাবান, মামুলি শ্যাম্পু বা চুলধোবার বাজারচলতি সব উপকরণে ধোবার ফলে চুলের স্বাভাবিক গুণ ও আর্দ্রতা খোয়া যায়। জোরে ঘষাঘষি করতে হলে চুল তো আরো কাহিল, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বেই।

কাজেই চিরুনিতে আঁচড়ে জট ছাড়াবার চেষ্টা করবেননা – চুলের ডগা ভেঙে যেতে পারে। তার বদলে চুলে জোগান দিন :

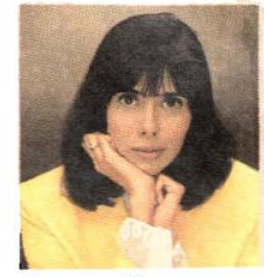

কলিন
ফিল্ম হেয়ার স্টাইলিস্ট

নতুন সানসিল্ক আফটারওয়াশ কণ্ডিশনার চুলের বিশেষ খোরাক।

আপনার চুল যখন ধোবার পরে যত্নের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে, তখনি নতুন সানসিল্ক আফটারওয়াশ কণ্ডিশনার সবচেয়ে ভালো কাজ করে। এটি চুলের জট তো ছাড়িয়ে দেয়ই, তাছাড়া সবরকম ক্ষতি থেকে চুল সুরক্ষিত রাখে, সুমসৃণ সুন্দর করে তাকে।

চুল ধোবার পরে, বাড়তি জলটা নিংড়ে ফেলুন। যথেষ্ট সানসিল্ক আফটারওয়াশ কণ্ডিশনার লাগান, যাতে চুলের আগা থেকে গোড়া এটি একটি পরত দিয়ে দেয়। এতে ফেনা হয়না।

মিনিটদুই ঐভাবেই রেখে দিন যাতে চুল নিউট্রাকেয়ারের পুষ্টিগুণ পর্যাপ্তভাবে শুষে নিতে পারে।

এবার চুল ধুয়ে ফেলুন। সঠিক খোরাকে পরিতৃপ্ত চুলের পরশ দেখুন কত সুখপ্রদ, কত সুমসৃণ।

সানসিল্ক আফটারওয়াশ কণ্ডিশনারের গুণ ধোবার অনেক, অনেক পরেও বজায় থাকে, কাজেই আপনার চুলও থাকে পুরোপুরি জটমুক্ত ও তেমনি মজবুত।

তোয়ালে দিয়ে শুকনো করে মুছে ভিজে চুল আঁচড়ে নিন। আর চুল ভেঙে যাবার ভয় নেই।
আপনার চুল এখন মজবুত, জটমুক্ত, পরিপূর্ণ যত্নে পরিতৃপ্ত। রোজকার মতই চুল শুকিয়ে নিন।

কিনুন সাশ্রয়কর স্যাশে, দাম মাত্র টা. 2/-

সানসিল্ক

আ ফ টা র ও য়া শ

ক ণ্ডি শ না র

নি উ ট্রা কে য়া র যু ক্ত

"মখমলী মোলায়েম সুন্দর চুল, আগে যেমনটি কখনো ছিলনা"

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

বাছাইকরা শহরে পাবেন।

HTA.2963.95

রেস্তোরাঁর ম্যাজিক... এখন বাড়িতেই!

সানরাইজ মশলা চট্‌জলদি...রেডী-মিক্স...দারুন সোজা...

রেস্তোরাঁর ম্যাজিক বাড়িতেই? ঠিক তাই। আমরা সম্ভব করেছি! আমিষ কি নিরামিষ—সেই জিভে জল আনা স্বাদ—লোভনীয় রকমারি রান্না—এখন বাড়িতে রেঁধে ফেলা কি সোজা। আর এ হ'ল সানরাইজ মশলার ম্যাজিক!

● চিকেন তন্দুরী মশলা ● আলুদম মশলা ● মীট মশলা ● ছোলা মশলা ● পাও ভাজী মশলা ● সাম্বার মশলা ● সব্জী মশলা ● নুডুলস্ মশলা ● গরম মশলা ● জিরা কুল (জল জিরা) ● চাট মশলা ● মুড়ি মশলা ● ফিস্ মশলা ● বিরিয়ানী-পোলাও মশলা ● শাহী গরম মশলা ● কাসুরী মেথী ● কাশ্মীরী মির্চ ● তরকা মশলা ● আমচুর...

এছাড়া, সানরাইজ-এর অন্যান্য মশলা যেমন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, বছরের পর বছর ধরেই সুগৃহিনীদের সঙ্গী।

সানরাইজ মশলা

সানরাইজ স্পাইসেস প্রাঃ লিঃ
৪৬ পাথুরিয়াঘাট ষ্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬
ফোন: ২৩৯ ৪১৮৭/৮৩০১/৯২৬৭
ফ্যাক্স: ২৩৯ ৩১৬৩

রকমারি... তাড়াতাড়ি—খাও ধীরে সুস্থে

পৃথিবীর শ্বাসপ্রশ্বাস

● পৃথিবী যেন তার জীবকুলের মতোই দম নেয়, দম ছাড়ে প্রতিনিয়ত। আর এর ফলেই বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অক্সিজেন চক্র অব্যাহত থাকে। পৃথিবী কী পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ে তার প্রথম 'কম্পিউটার মডেল' তৈরি করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা'-র অ্যামিস রিসার্চ সেন্টার। এই মডেল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যের বিনাশ এবং ভূমি ব্যবহারজনিত প্রভাব বুঝতে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করবে। ওই সংস্থার বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার পটার বলেছেন, সালোকসংশ্লেষের সময় উদ্ভিদরা কার্বন- ডাই- অক্সাইড শুষে নেয়, অন্যদিকে মাটির মধ্যে মৃত উদ্ভিদের ক্ষয়কারী জীবাণুরা সেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড মুক্ত করে। এ ছাড়া প্রাণী উদ্ভিদের শ্বসনেও মুক্ত হয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এই দুটি প্রাকৃতিক পদ্ধতির মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য বজায় থাকে, অব্যাহত থাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড চক্র, উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ মারফত পাওয়া তথ্যাদির ভিত্তিতে তার কম্পিউটার মডেল তৈরি হয়েছে। এই মডেল থেকে জানা যাচ্ছে, পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলেই ৬০ শতাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড এইভাবে শোষিত ও মুক্ত হয়। একেই বলা হচ্ছে পৃথিবীর শ্বসনক্রিয়া।

কানে কম শুনলেও

● যাঁরা কম শোনেন তাঁদেরও সঙ্গীত উপভোগে ব্যাঘাত ঘটবে না, যদি হাতের কাছে থাকে 'কোরাস' সংস্থার তৈরি সহায়ক শ্রবণ ব্যবস্থা। এই সিস্টেম পাওয়া যায় বিভিন্ন মডেলে এবং যে-কোনও ধরনের অডিও সিস্টেম— রেডিও, টেপ ইত্যাদির সঙ্গে জুড়ে নেওয়া যায়।
এর হেডফোন কানে লাগালেই কানে যিনি খাটো, সুর বা ধ্বনি সঠিক মাত্রায় শুনতে তাঁর কোনও অসুবিধেই হবে না। এতে আছে উচ্চশক্তির সূক্ষ্ম মাইক্রোফোন ব্যবস্থা। দাম ৪২০ ডলার।

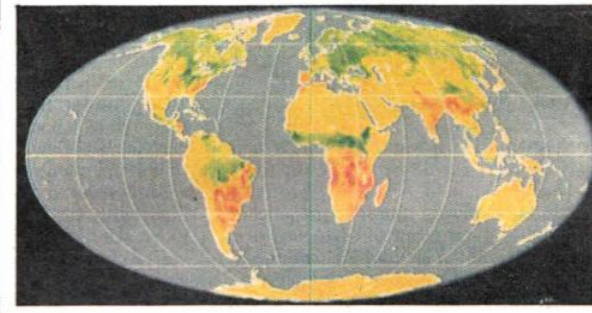

ওজনে হালকা কাজে পটু

● 'স্ট্যান্লি টুল' কোম্পানির তৈরি এই হাতুড়ি চেহারায় আর-পাঁচটা হাতুড়ির মতোই। কিন্তু ওজনে ২০ আউন্সের বেশি নয়। অথচ কাজে খুবই দড়। 'জ্যাকেটেড স্টিল আই-বিম হ্যামার' নামে এই হাতুড়ি তৈরি করা হয়েছে ইস্পাতের সঙ্গে পলিকার্বনেট রেজিন মিশিয়ে। যার ফলে এর স্থিতিস্থাপকতা এবং আঘাত-সহন ক্ষমতা খুব বেশি। ১৬ থেকে ২০ আউন্স বিভিন্ন ওজনে পাওয়া যায়। দাম ২৫ থেকে ৩০ ডলার।
ভাস্কর

মিয়াঁদাদ খেললে এ হবে এক অনন্য রেকর্ড

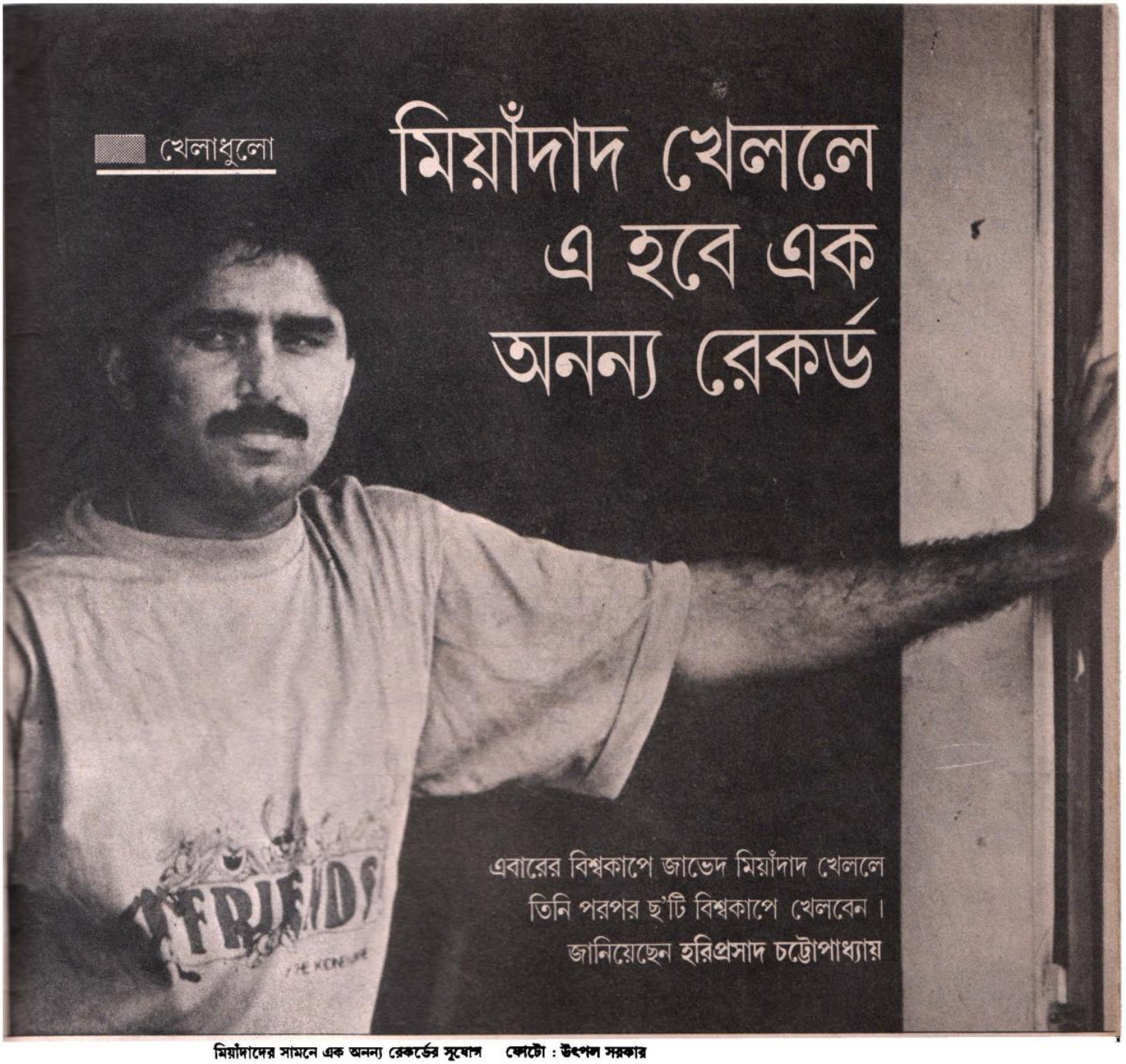

এবারের বিশ্বকাপে জাভেদ মিয়াঁদাদ খেললে তিনি পরপর ছ'টি বিশ্বকাপে খেলবেন। জানিয়েছেন হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মিয়াঁদাদের সামনে এক অনন্য রেকর্ডের সুযোগ ফোটো : উৎপল সরকার

এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৬) জাভেদ মিয়াঁদাদ কি খেলছেন ? ১৯৯৪-এর ৬ এপ্রিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর অনুরোধে তিনি সিদ্ধান্ত বদল করেন। তবে আঘাত পাওয়ার ফলে এই মুহূর্তে তিনি দলে নেই। ষষ্ঠ বিশ্বকাপে শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের হয়ে যদি মিয়াঁদাদ খেলতে নামেন, তা হলে টানা ছ'টি বিশ্বকাপেই খেলার এক অভূতপূর্ব নজির তৈরি করবেন তিনি। মিয়াঁদাদেরও তাই ইচ্ছা। কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন, "আমার লক্ষ্য ১৯৯৬-এর বিশ্বকাপেও পাকিস্তানের হয়ে খেলা। তা হলে ছ'টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেটার হব আমিই। এবং এই গৌরব সহজে কেউ কেড়েও নিতে পারবে না।" ছ'টি বিশ্বকাপে খেলার রেকর্ড মিয়াঁদাদ গড়তে পারবেন কি না, তা শিগগির জানা যাবে। তবে বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের রেকর্ডটি রয়েছে মিয়াঁদাদেরই দখলে। গত পাঁচটি বিশ্বকাপে ২৮টি ম্যাচ খেলে তিনি ১০২৯ রান করেছেন, একটি শতরান ও আটটি 'হাফ সেঞ্চুরি' সমেত। দ্বিতীয় স্থানে আছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন অধিনায়ক ভিভিয়ান রিচার্ডস। ২৩টি ম্যাচ খেলে তিনি ১০১৩ রান

বিশ্বকাপের সেরা পাঁচ ব্যাটস্‌ম্যান

ব্যাটস্‌ম্যান	দেশ	ম্যাচ	ইনিংস	নঃ আঃ	রান	গড়	সর্বোচ্চ	১০০	৫০
জাভেদ মিয়াঁদাদ	পাকিস্তান	২৮	২৭	৪	১০২৯	৪৪.৭৪	১০৩	১	৮
ভিভিয়ান রিচার্ড্‌স	ওঃ ইঃ	২৩	২১	৫	১০১৩	৬৩.৩১	১৮১	৩	৫
গ্রাহাম গুচ	ইংল্যান্ড	২১	২১	১	৮৯৭	৪৪.৮৫	১১৫	১	৮
মার্টিন ক্রো	নিউজিল্যান্ড	২১	২১	৫	৮৮০	৫৫.০০	১০০*	১	৮
ডেসমণ্ড হেন্‌স	ওঃ ইঃ	২৫	২৫	২	৮৫৪	৩৭.১৩	১০৫	১	৩

ডিন জোন্স

মার্টিন ক্রো

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সেরা দশ ব্যাটস্‌ম্যান

ব্যাটস্‌ম্যান	দেশ	ম্যাচ	ইনিংস	নঃআঃ	রান্‌	গড়	সর্বোচ্চ	১০০	৫০
ডেসমন্ড হেন্‌স	ওঃ ইঃ	২৩৮	২৩৭	২৮	৮৬৪৮	৪১.৩৭	১৫২*	১৭	৫৭
জাভেদ মিয়াঁদাদ	পাকিস্তান	২২৮	২১৬	৪১	৭৩২৭	৪১.৮৬	১১৯	৮	৫০
ভিভিয়ান রিচার্ড্‌স	ওঃ ইঃ	১৮৭	১৬৭	২৪	৬৭২১	৪৭.০০	১৮৯*	১১	৪৫
অ্যালান বর্ডার	অস্ট্রেলিয়া	২৭৩	২৫২	৩৯	৬৫২৪	৩০.৬২	১২৭*	৩	৩৯
ডিন জোন্স	অস্ট্রেলিয়া	১৬৪	১৬১	২৫	৬০৬৮	৪৪.৬১	১৪৫	৭	৪৬
ডেভিড বুন	অস্ট্রেলিয়া	১৮১	১৭৭	১৬	৫৯৬৪	৩৭.০৪	১২২	৫	৩৭
রিচি রিচার্ড্‌সন	ওঃ ইঃ	২০৬	১৯৯	২৭	৫৬৮৯	৩৩.০৭	১২২	৩	৪১
মহম্মদ আজহারউদ্দিন	ভারত	১৯৪	১৭৯	৩৫	৫২৮৮	৩৬.৭২	১০৮*	৩	৩০
সেলিম মালিক	পাকিস্তান	২১০	১৯০	২৭	৫২৭১	৩২.৩৪	১০২	৫	৩১
গর্ডন গ্রিনিজ	ওঃ ইঃ	১২৮	১২৭	১৩	৫১৩৪	৪৫.০৩	১১৯*	৮	২৯

★ নট আউট

পরিসংখ্যান ২৮ মে, ১৯৯৫ পর্যন্ত

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

রিচি রিচার্ড্‌সন

গর্ডন গ্রিনিজ

ডেসমন্ড হেন্‌স

মহম্মদ আজহারউদ্দিন

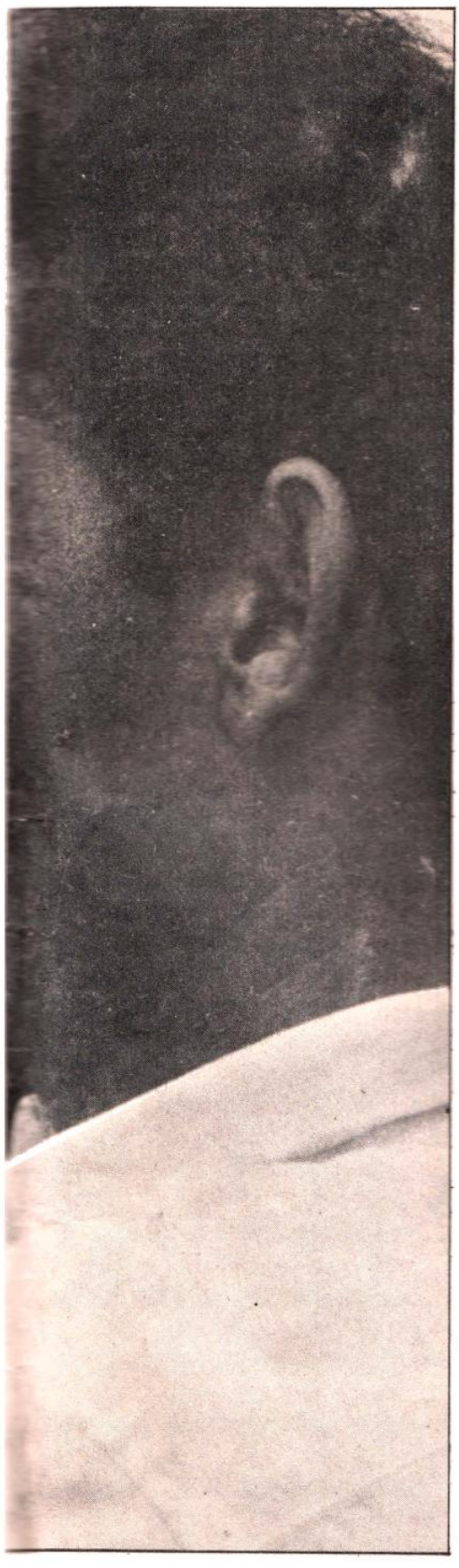

করেছেন, ৬৩.৩১ গড় রেখে, মিয়াঁদাদের গড় সেখানে ৪৪.৭৪। রিচার্ড্সের কৃতিত্ব হল, মিয়াঁদাদের চেয়ে তিনি পাঁচটি ম্যাচ কম খেলেছেন, কিন্তু মাত্র ১৬ রানে পিছিয়ে রয়েছেন। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন গ্রাহাম গুচ, চতুর্থ স্থানে মার্টিন ক্রো ও পঞ্চম স্থানে ডেসমন্ড হেন্স। গুচ ২১টি ম্যাচে ৮৯৭ রান করেছেন, সমসংখ্যক ম্যাচে মার্টিন ক্রো করেছেন ৮৮০ রান, ২৫টি ম্যাচে হেন্সের সংগ্রহ ৮৫৪ রান। রিচার্ড্স গত বিশ্বকাপের আগেই অবসর নিয়েছেন, গুচ সরে দাঁড়ালেন কিছুদিন আগে। ষষ্ঠ বিশ্বকাপে হেন্সও খেলবেন কি না, বলা যাচ্ছে না। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান নির্বাচকদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য চলছে। মিয়াঁদাদ যদি না খেলেন, তা হলে তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান সংগ্রহের রেকর্ডটি ছিনিয়ে নিতে পারেন মার্টিন ক্রো-ই। আর-একজনেরও এই সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড বুন। মাত্র ১৬টি ম্যাচে ৮১৫ রান করে বুন রয়েছেন ষষ্ঠ স্থানে। শুধু বিশ্বকাপে নয়, একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারীদের তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন বুন। ১৮১টি ম্যাচে তিনি আপাতত করেছেন ৫৯৬৪ রান। বিশ্বকাপের এক নম্বর ব্যাটস্ম্যান মিয়াঁদাদের স্থান একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দু' নম্বরে। এবং এখানে শীর্ষে রয়েছেন বিশ্বকাপের পাঁচ নম্বর ব্যাটস্ম্যান ডেসমন্ড হেন্স। হেন্স এতটাই এগিয়ে আছেন যে, তাঁকে টপকাতে সময় লাগবে। একদিনের আন্তর্জাতিকে হেন্স এ-পর্যন্ত ৮৬৪৮ রান করেছেন, ২৩৮টি ম্যাচে। শতরান করেছেন ১৭টি, হাফ সেঞ্চুরি ৫৭টি। এই দুটিও একদিনের ক্রিকেটের রেকর্ড। দ্বিতীয় স্থানে মিয়াঁদাদ, ২২৮টি ম্যাচে ৭৩২৭ রান করেছেন, অর্থাৎ হেন্সের চেয়ে মিয়াঁদাদ ১৩২১ রানে পিছিয়ে রয়েছেন। ফলে হেন্সকে অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তৃতীয় স্থানাধিকারী ভিভিয়ান রিচার্ড্স (১৮৭টি ম্যাচে ৬৭২১) ও চতুর্থ স্থানাধিকারী অ্যালান বর্ডার (২৭৩টি ম্যাচে ৬৫২৪) অবসর নিয়ে ফেলেছেন। তা হলে হেন্সকে টপকাবেন কে ? এই মুহূর্তে একদিনের আন্তর্জাতিকের সেরা দশ ব্যাটস্ম্যানের তালিকায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের পক্ষে হেন্সের রান টপকানোর কাজটা বেশ কঠিন। বুন (১৮১টি ম্যাচে ৫৯৬৪), রিচি রিচার্ড্সন (২০৬টি ম্যাচে ৫৬৮৯), মহম্মদ আজহারউদ্দিন (১৯৪টি ম্যাচে ৫২৮৮) বা সেলিম মালিকের (২১০টি ম্যাচে ৫২৭১) পক্ষে যদি শেষপর্যন্ত এই রেকর্ড ভাঙা সম্ভব হয়ও, তার জন্য সময় লাগবে। সেলিম মালিক সম্প্রতি পাকিস্তান টিমের নেতৃত্ব হারিয়েছেন, সেইসঙ্গে বাদ পড়েছেন দল থেকেও। তিনি ছাড়া বাকি তিনজন অর্থাৎ বুন, রিচার্ড্সন বা আজহারের প্রত্যেকেরই হেন্সকে অতিক্রম করার জন্য দরকার তিন হাজারের কিছু কম বা বেশি রান। কাজটা অত্যন্ত কঠিন। সুখের কথা, সীমায়িত ওভারের ক্রিকেটে সেরা দশ ব্যাটস্ম্যানের তালিকায় বর্তমান ভারতীয় অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিনের নাম আছে। একদিনের ক্রিকেটে গত কয়েক বছর ধরেই তিনি ধারাবাহিকভাবে রান পাচ্ছেন। আজহারই প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে পাঁচ হাজার রানের গণ্ডি অতিক্রম করেছেন। বলার কথা, সেরা দশ ব্যাটস্ম্যানের তালিকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের চারজন, অস্ট্রেলিয়ার তিনজন, পাকিস্তানের দু'জন এবং ভারতের একজন রয়েছেন। অথচ এই তালিকায় ইংল্যান্ডের কারও নাম নেই, নেই নিউজিল্যান্ডের কোনও ক্রিকেটারের নামও। বিশ্বকাপের সেরা পাঁচ ও একদিনের আন্তর্জাতিকের সেরা দশ—এই দু'টি

বিশ্বকাপের সেরা ব্যাটস্ম্যান ভিভ রিচার্ড্স

তালিকাতেই নাম রয়েছে মিয়াঁদাদ, হেন্স ও রিচার্ড্সের। বিশ্বকাপ ও একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট—দুটোতেই ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলার কৃতিত্ব কিন্তু একই ব্যক্তির। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় 'কিং রিচার্ড্স'। রাজকীয় ভঙ্গিমায় রিচার্ড্স বিশ্বকাপের সেরা ১৮১ রানের ইনিংসটি খেলেন ১৯৮৭ সালে, করাচিতে, শ্রীলঙ্কার বোলিংকে উড়িয়ে দিয়ে। একদিনের আন্তর্জাতিকে অপরাজিত ১৮৯ রানের সেরা ইনিংসটি তিনি উপহার দেন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাঞ্চেস্টারে, ১৯৮৪ সালে। বিশ্বকাপের সেরা পাঁচে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক গুচ ও নিউজিল্যাণ্ডের মার্টিন ক্রোর নাম থাকলেও একদিনের সেরা দশে তাঁরা স্থান পাননি। গুচের সেই সম্ভাবনা আর নেই। তবে মার্টিন ক্রোর আছে। তেন্ডুলকর বা লারার নাম কবে দেখব ? সম্ভবত বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

মেরি পিয়ার্স

উইম্বলডনই সেরা গ্র্যান্ড স্লাম প্রতিযোগিতা

খেলাধুলো

খেলতে পারেননি, জার্মান ওপেনে, পিঠের ব্যথা তাঁকে কয়েক মাস ধরেই বেশ ভোগাচ্ছে। তবু গ্রাফ উইম্বলডনে সবসময়ই ভয়ঙ্কর, তাঁর গতি, সার্ভ এবং অবশ্যই ভলি বিপজ্জনক। গত বছর মাত্র একটা গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন। এবার সেই ঘাটতিটা তিনি পুষিয়ে নিতে চান।
অরান্থা সাঞ্চেজ ভিকারিওর বিশ্বসেরার স্বপ্ন সফল

টেনিসের সবচেয়ে সম্মানজনক প্রতিযোগিতা উইম্বলডনে প্রতিবারের মতো এবারেও শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। লিখেছেন সুমন ভট্টাচার্য

ফরাসি ওপেনের রেশ কাটতে-না-কাটতেই এসে গেল উইম্বলডন। গত মাসের শেষ থেকে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চলছে টেনিসের সবচেয়ে সম্মানজনক প্রতিযোগিতার আসর। 'অল ইংল্যান্ড লন টেনিস অ্যান্ড ক্রোকে ক্লাব'-এর সবুজ ঘাসের কোর্টে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট নিয়ে চলবে লড়াই। আরও তিনটি গ্র্যান্ড স্লাম থাকলেও উইম্বলডন যেন আলাদা, আভিজাত্যে অতুলনীয়। যতই ব্রিটেনের ডেভিস কাপ দলের অধিনায়ক নিন্দা করুন ঘাসের কোর্টের, সমালোচকরা যতই বলুক উইম্বলডন বড় বেশি সার্ভনির্ভর খেলোয়াড়দের জন্য, তবু অঘটনের সমস্ত আশঙ্কা নিয়েই উইম্বলডন অনন্য।
গত কয়েক মাস ধরে স্টেফি গ্রাফ আর অরান্থা সাঞ্চেজ ভিকারিওর মধ্যে যে ট্রাপিজের খেলা চলছে তার চূড়ান্ত রূপ নিঃসন্দেহে আমরা দেখতে পাব উইম্বলডনে। জ্বরের জন্য দেশের মাটিতে

অরান্থা সাঞ্চেজ ভিকারিও

করতে হলে উইম্বলডনই সেরা জায়গা। গত বছর বাবা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলেও তিনি টেনিস থেকে সরে দাঁড়াননি, ফল পেয়েছেন বছরে দুটো গ্র্যান্ড স্লাম। কিছুদিন আগেই জিতেছেন জার্মান ওপেন। চমৎকার ফর্মে আছেন স্পেনের এই তরুণী।
মেরি পিয়ার্স চকোলেট এবং আইসক্রিম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন আরও রোগা হবেন বলে। হয়তো হয়ে উঠতে চান আরও ভয়ঙ্করও। এমনিতেই তাঁর টিম ফোরহ্যান্ডকে সকলেই এড়িয়ে চলে। গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের স্বাদও ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন। ফলে মানসিকতাতেও তিনি পিছিয়ে নেই।
সামনের সারিতে আছেন গতবারের বিজয়ী কনচিতা মার্টিনেজও। ২৩ বছরের এই স্পেনের তরুণী ইতিমধ্যে টানা চারটি প্রতিযোগিতা জিতেছেন। মার্টিনেজ পুরনো কোচ এরিক ভ্যান হারপেনকে ছেড়ে বেছে নিয়েছেন ব্রাজিলের কারলোস কিরমারকে। নতুন কোচ মার্টিনেজের

এখানেই বসবে উইম্বলডনের আসর

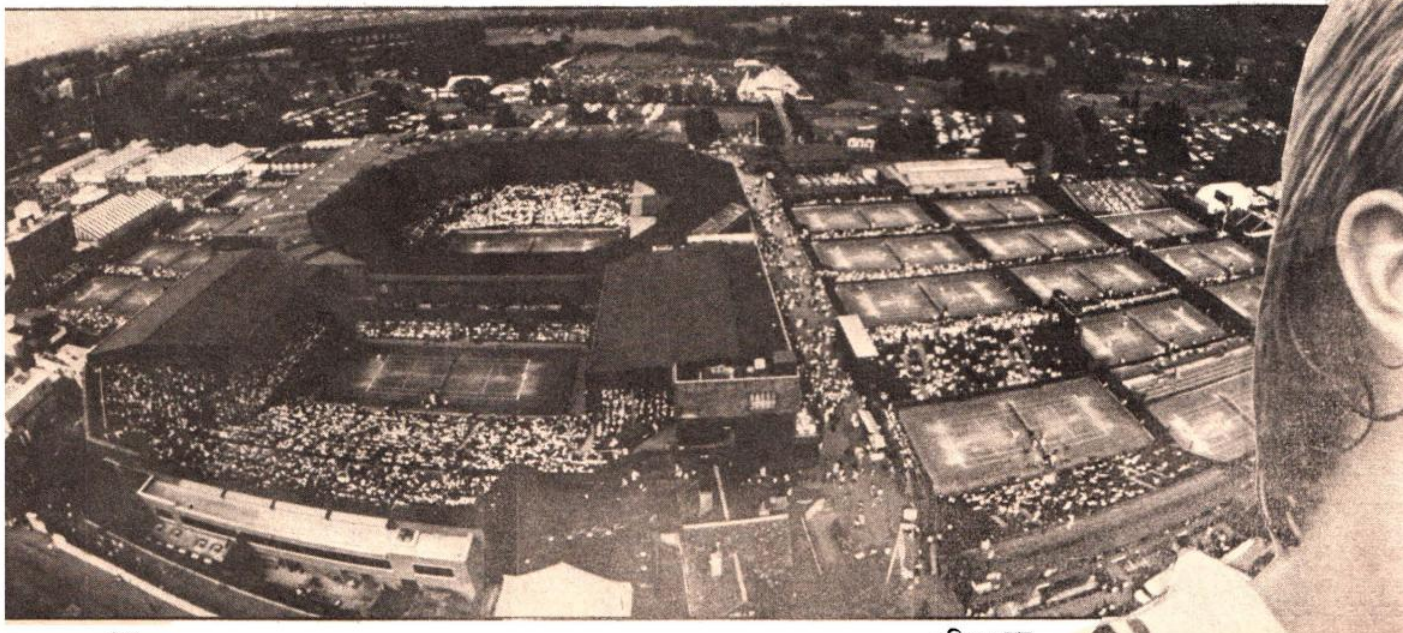

বরিস বেকার

খেলায় কী পরিবর্তন এনেছেন তা জানা যায়নি, কিন্তু মানসিকভাবে তাঁকে অনেক শক্ত করে তুলেছেন, বলা বাহুল্য। মার্টিনেজকে প্রভাবিত করেছেন বন্ধু এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাবল্‌স বিশেষজ্ঞ গিগি ফার্নান্ডেজও। এ-বছরে তাঁর সম্ভাবনা কতটা সেটা বলা মুশকিল। যদিও ইতালিয়ান ওপেনে হারিয়েছেন এমনকী অরান্থাকে।

পুরুষদের উইম্বলডনেও এবার এক নম্বর স্থান দখলে রাখার জন্য হবে রীতিমত লড়াই। গত বছরের মতো বিস্ফোরক ফর্মে নেই সাম্প্রাস, তবু গতবারের চ্যাম্পিয়ান সহজে হাল ছাড়বেন না। ইতালিয়ান ওপেনে হেরেছেন। হেরেছেন বার্সেলোনাতেও, তবুও সাম্প্রাস আছেন। পায়ের আঘাতে কাতর, কোচ গুলিকসনের অনুপস্থিতি তাঁকে দুর্বল করেছিল। অতএব সাম্প্রাস নিশ্চয়ই শীর্ষে ফিরতে চাইবেন। আগাসিও এখন নিজেকে অনেক বদলেছেন, ব্রাড গিলবার্টের পরামর্শ তাঁকে অনেক সংযত এবং অভিজ্ঞ করে তুলেছে। উইম্বলডন আগেও জিতেছেন আগাসি। অতীতের মতো পালাতে চান না সেন্টার কোর্ট থেকে। ফলে দু'জনের কাছেই উইম্বলডন গুরুত্বপূর্ণ।

তবে উইম্বলডনের প্রসঙ্গ উঠলেই দু'জনের কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হয়, বরিস বেকার আর স্তেফান এডবার্গ। মন্টিকার্লো ওপেনে টমাস

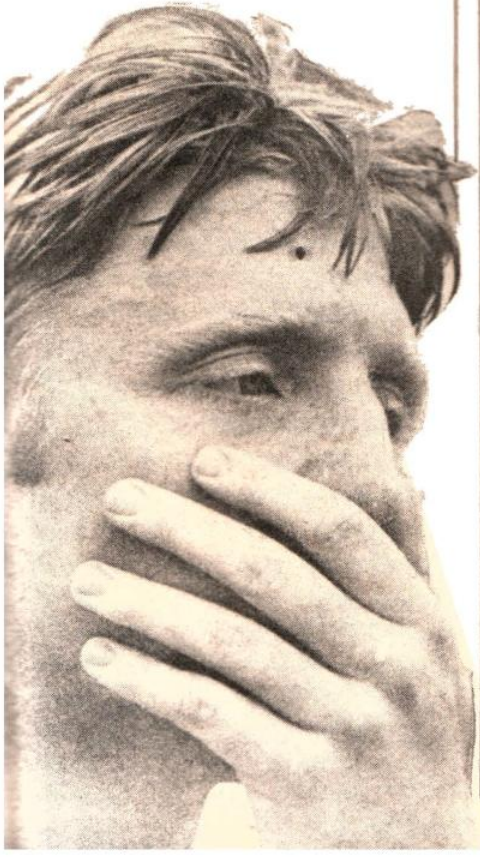

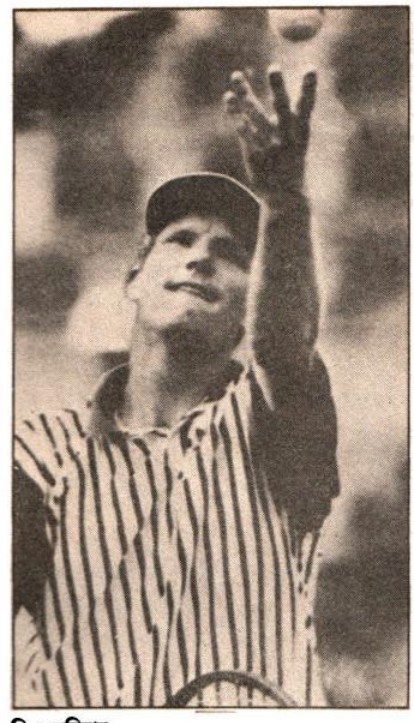

জিম কুরিয়ার

স্টেফি গ্রাফ

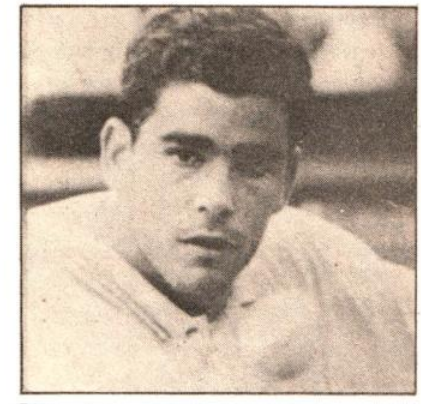

পিট সাম্প্রাস

আন্দ্রে আগাসি

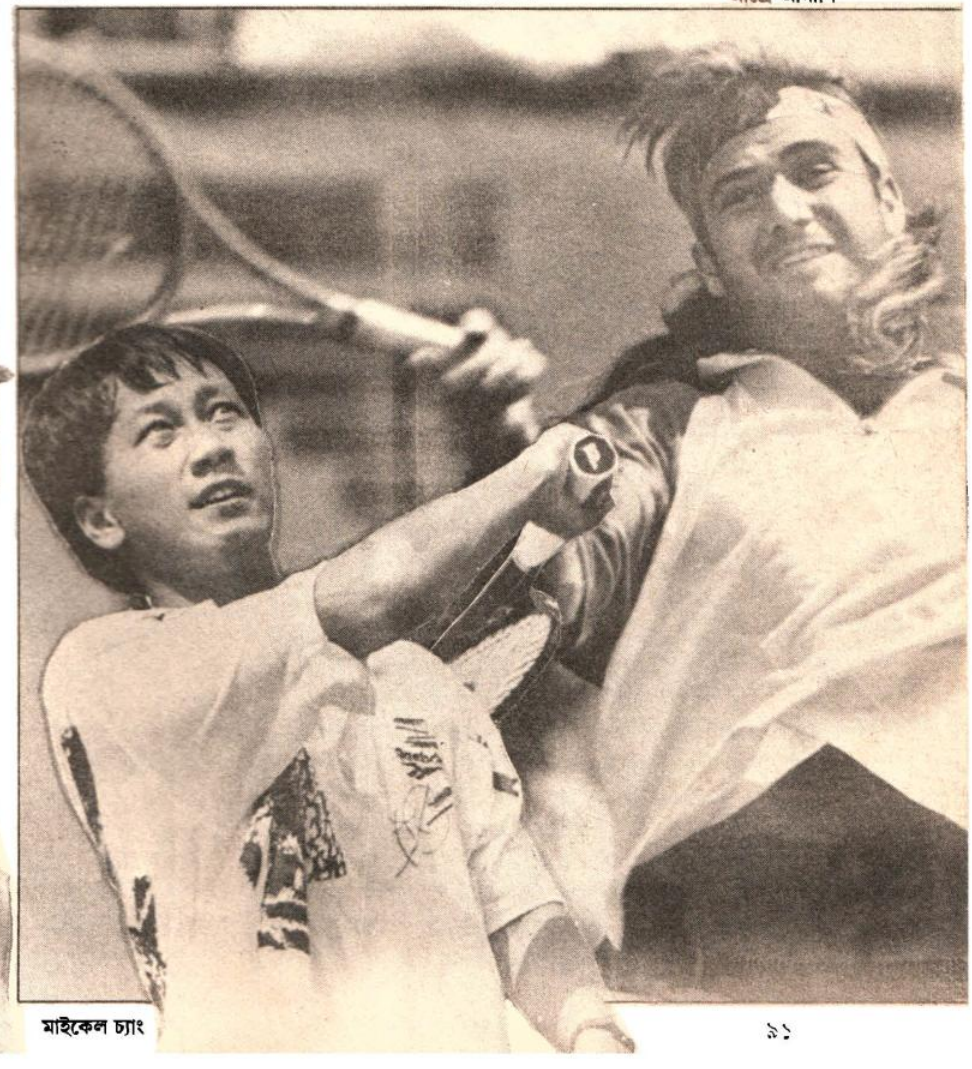

মাইকেল চ্যাং

বাড়ছে পুরস্কারের অর্থমূল্য

পেশাদারদের জন্য দরজা খুলে যাওয়ার পর থেকে উইম্বলডনের পুরস্কারের অর্থমূল্য বেড়েই চলেছে। এ-বছর যেমন গত বছরের তুলনায় উইম্বলডনের পুরস্কার বাড়ছে ৬%। গত বছর পুরস্কারের মোট অর্থ ছিল ৫.৬৮ মিলিয়ন পাউন্ড। এ-বছর সেটা দাঁড়াচ্ছে ৬ মিলিয়ন পাউন্ডে। পুরুষদের চ্যাম্পিয়ান পাবে ৩৬৫ হাজার পাউন্ড, অন্যদিকে মহিলাদের মধ্যে বিজয়ী পাবেন ৩২৮ হাজার পাউন্ড। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, চারটি গ্র্যান্ড স্লাম প্রতিযোগিতার মধ্যে একমাত্র উইম্বলডন এবং ফরাসি ওপেনেই মহিলা চ্যাম্পিয়ানের চেয়ে বেশি অর্থ পান পুরুষ চ্যাম্পিয়ান। প্রথম উইম্বলডনে খেলোয়াড়দের প্রবেশমূল্য থেকে ২২ গিনি উঠেছিল এবং বিজয়ী গোরে পেয়েছিলেন ১২ গিনি। রানার্স আপ সাত গিনি। গত ১০ বছরেও পুরস্কারের অর্থমূল্য বেড়েছে প্রায় তিনগুণ। ১৯৮৫ সালে বেকার জিতে পেয়েছিলেন ১,৩০,০০০ পাউন্ড, আর মার্টিনা ১,১৭,০০০ পাউন্ড। অথচ পেশাদারি টেনিসের গোড়ার দিকে মোট পুরস্কার ছিল ২,০০০ পাউন্ড, যার মধ্যে ৭৫০ পাউন্ড ছিল মহিলাদের জন্য।

মাইকেল স্টিখ

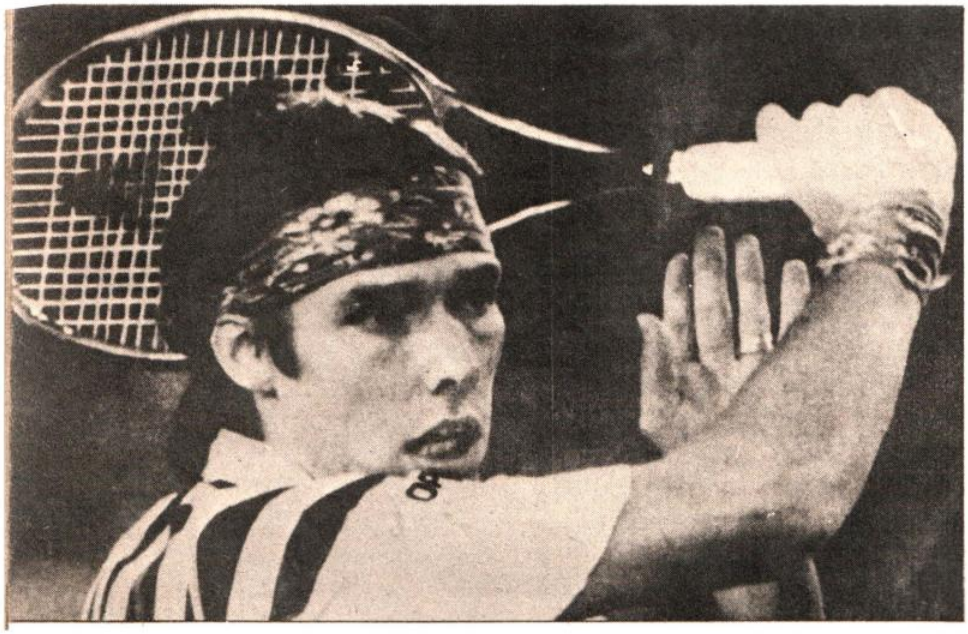

সংবাদমাধ্যমে উইম্বলডন

উইম্বলডন নিয়ে সারা বিশ্বের সংবাদমাধ্যমগুলির আগ্রহের অন্ত নেই। এ-বছরই সংবাদপত্র জগতের ধনকুবের রুপার্ট মারডকের ফক্স নেটওয়ার্ক বহু চেষ্টা করেও এন.বি.সি-র সঙ্গে উইম্বলডনের দূরদর্শন স্বত্ব কিনতে পারেনি। জন ম্যাকেনরো এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "ভালই হয়েছে। তা না হলে টেনিসেও রাজনীতি ঢুকে পড়ত।" আর-একটি সংস্থা এইচ.বি.বি.ও নেটওয়ার্ক উইম্বলডনের জন্য ৫৭ ঘন্টা করে সম্প্রচার করবে, এর মধ্যে ৪৩ ঘন্টাই সরাসরি। মজার কথা ১৯৩৭ সালে ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক দেখানোর সময় হঠাৎ ২৫ মিনিট অস্টিন আর রজার্সের খেলা দেখানোর মধ্য দিয়ে দূরদর্শনে উইম্বলডনের সূচনা। তখন মাত্র ২০০০ বাড়িতে টিভি ছিল, আর এখন ৯০টিরও বেশি দেশে ৩৫ কোটিরও বেশি মানুষ টিভি দেখেন। রেডিওতে উইম্বলডনের ধারাভাষ্য দেওয়া শুরু হয় ১৯২৭ সালে, কিন্তু জনপ্রিয় করেন ম্যাক্স রবার্টসন। তিনিই ১৯৩৯-এ শ্রোতাদের অনুরোধে দ্রুত বিবরণ দেওয়ার জন্য খেলোয়াড়দের শুধু পদবি উল্লেখ করতে শুরু করেন।

প্রথম বছর উইম্বলডনের খবর গুরুত্বের সঙ্গে ছেপেছিল একমাত্র 'দ্য ফিল্ড' পত্রিকা। 'দ্য টাইম' ছেপেছিল মাত্র কয়েক লাইন। তাও ভুল খবর। এখন কিন্তু ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড থেকে নামী পত্রিকাগুলোও উইম্বলডন নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

মুস্টারের কাছে হারার পর পাঁচ সেটের লড়াইয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে ড্রাগ নেওয়ার অভিযোগ তুলে টেনিস-দুনিয়ায় যথেষ্ট ঝড় তুলে দিয়েছেন বেকার। তবে জার্মান টেনিস-তারকা অবশ্যই আরও ঝড় তুলতে পছন্দ করবেন উইম্বলডনের কোর্টে। দীর্ঘদিন গুরুত্ব না দেওয়ার পর ১৯৯৪ সালে আবার দারুণভাবে টেনিসে ফিরে এসেছেন বেকার। কৈশোরের সেই ফুটবলারের মতো দক্ষতা হয়তো আর নেই, কিন্তু উইম্বলডন মানেই বেকার ভয়ঙ্কর। তাঁর এককালের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ঘাসের কোর্টের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক এডবার্গও উইম্বলডনের পরিচিত ব্যক্তিত্ব। অনেক নেমে গেছেন এ.টি.পি র‍্যাঙ্কিং-এ, তবু ছ' ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা সুইডিশ খেলোয়াড় সবসময়ই ভেলকি দেখাতে পারেন। ২৯ বছর বয়সেও তাঁর ফুটওয়ার্ক দারুণ এবং ঘাসের কোর্টের পক্ষে সেটা দরকারও। বেকারের আর-এক সতীর্থ, প্রাক্তন বিজয়ী স্টিখও উইম্বলডনে চেষ্টা করবেন নিজেকে ফিরে পেতে। বিশেষ করে ডেভিস কাপে ভাল খেলার পর।

ক্রোয়েশিয়ার গোরান ইভানিসেভিচ দু'- দু'বার উইম্বলডনের ফাইনালে উঠেও খালি হাতে ফিরে গেছেন। বছরের জার্মান ওপেনে হেরেছেন মেদভেদেভের কাছে ফাইনালে, যদিও তার শোধ তুলেছেন ইতালিয়ান ওপেনে তাঁকেই হারিয়ে। ইভানেসেভিচের এস'-কে আটকানো উইম্বলডনে বেশ কঠিন। মাইকেল চ্যাং ও ম্যাকেনরোর চ্যালেঞ্জের উত্তর দেওয়াই শুধু নয়, দূর করতে চাইবেন গ্র্যান্ড স্লামের খরাও। এ.টি.পি র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠেছেন চ্যাং, আগাসিকে হারিয়ে জিতেছেন এ. টি অ্যান্ড টি চ্যালেঞ্জ টুর্নামেন্টও। ক্লে কোর্ট স্পেশালিস্ট ব্রুগুয়েরা কিংবা টমাস মুস্টারকে বাদ দিলে কাফেলনিকভ বা বেরাসাতেগুই কী করেন, সেটাই দেখার। কাফেলনিকভ অপ্রত্যাশিতভাবে হেরেছেন ইতালিয়ান ওপেনে। স্প্যানিশ তারকা বেরাসাতেগুই খুব একটা স্বস্তিতে নেই, হারছেন অনামীদের কাছে। তবু টড মার্টিনের মতো দুরন্ত সার্ভ বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি নজরে থাকবেন এই দুই উঠে-আসা টেনিস খেলোয়াড়।

বিশ্রাম এবং মানসিক অবসাদ অনেকটাই কাটিয়ে ফেলেছেন জিম কুরিয়ার। প্রিয় গানের দলের সঙ্গে বাজিয়েছেন ড্রামও। অতএব হালকা মেজাজে আবার যদি সত্যিই ফেরেন টেনিসে, তবে কুরিয়ার হয়ে উঠবেন অন্যতম বিপজ্জনক খেলোয়াড়। দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়েন ফেরিরা ফর্মে থাকলেও সুইডেনের ম্যাগনাস লারসেন কিন্তু ফর্মে নেই। ফ্রেঞ্চ ওপেনে হাত ঝালিয়ে নিয়ে এঁদের মধ্যে কে উইম্বলডনে চমক দেখাবেন, সেটাই এখন দেখবার।

খেলার খবর

নাইজিরিয়ার একটি পত্রিকা দু' বছর আগে ১৬ বছরের স্থানীয় এক কিশোর ফুটবলারের কাছে প্রশ্ন রেখেছিল, "তুমি শেষ পর্যন্ত কী হতে চাও?" কিশোরটি সরাসরি উত্তর দিয়েছিল, "আমি বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকার হতে চাই।" এই কিশোর ফুটবলারের নাম নওয়ানকো কানু। এখনও বিশ্বে সেরা হতে না পারলেও তাঁর লক্ষ্য পূরণে কিন্তু কানু এগিয়ে চলেছেন। ইউরোপিয়ান কাপ ফাইনালে আয়াক্স আমস্টারডাম দলের হয়ে এই তরুণ খেললেন চমৎকার। কানু খেলা শুরু করেন নাইজিরিয়ার ইয়ানয়ানউ ন্যাশনালের তরুণ দলে। প্রথম বছরেই তাঁর ক্লাব চ্যাম্পিয়ন এবং কানু 'টিনএজার প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার'-এর স্বীকৃতি পান। কিছুদিন পর, ১৯৯৩-এর এপ্রিলে নাইজিরিয়ার অনূর্ধ্ব ১৭ বছরের দলের সঙ্গে হল্যান্ডে খেলতে এসে নজরে পড়ে যান আয়াক্স কর্মকর্তাদের। আয়াক্সের ইয়ুথ দলে খেলতে থাকেন কানু। সেখানে ভাল খেললেও কিছুতেই সিনিয়ার দলে ঢুকতে পারছিলেন না। হঠাৎই গুরুত্বপূর্ণ কিছু খেলোয়াড় আঘাত পাওয়ায় দলে আসার সুযোগ পেয়ে যান কানু। প্রথম খেলায় বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নামেন। এর পরই তাঁর খেলা দেখে মুগ্ধ কোচ তাঁকে প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই সুযোগ দিতে বাধ্য হন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মিলানের বিপক্ষে তাঁর দুর্দান্ত খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান আয়াক্সের সমর্থকরা। কানুর ড্রিবলিং দক্ষতা, দারুণ দৌড়, প্রচণ্ড গতি—তাঁকে মাত্র ১৮ বছর বয়সেই শুধু হল্যান্ডেই নয়, ইউরোপের অন্যতম সেরা ফুটবলার করে তুলেছে। বিশ্বের সেরা ফুটবলার হওয়ার যে স্বপ্ন কানু দেখছেন, তাও অচিরেই পূর্ণ হবে, এ-আশা এখনই করা যায়।

❑

বড় ক্রিকেটার হওয়ার যে কত গুণ তা ভালরকম টের পেলেন পাকিস্তানের স্টার ব্যাটস্‌ম্যান ইনজামাম-উল-হক। নিজের দেশে খুব জনপ্রিয় ইনজামাম। সম্প্রতি গভীর রাতে করাচির রাস্তায় গাড়ি করে এক বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছিলেন ইনজামাম। লক্ষ্য, বাড়ি ফেরা। গাড়িতে ইনজামামের মূল্যবান কিছু জিনিসপত্র ছাড়াও নগদ এক লক্ষ টাকা ছিল। রাস্তায় চারজন দুষ্কৃতী লুঠতরাজ করার জন্য গাড়িটি ঘিরে ধরে। হঠাৎই তাদের মধ্যে একজন চিনতে পারে ইনজামামকে। সঙ্গে-সঙ্গে লুঠতরাজ না করে গাড়িটি ছেড়ে দেয় তারা। তবে দলের নেতা অবশ্য ইনজামামকে মৃদু তিরস্কার করতে ছাড়েনি। বলে, এত রাতে তাঁর একেবারেই বেরনো উচিত হয়নি।

❑

'বিশ্বের দ্রুততম দৌড়বীর' লেরয় বুরেলের সময় এখন ভাল যাচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে তিনি আহত ছিলেন। হাঁটুতে চোট থাকায় অনেকদিন ট্র্যাকে ফিরতে পারেননি বুরেল। গত বছর জুলাইতে সুইজারল্যান্ডের লুমানে ১০০ মিটার দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েন বুরেল। সময় নেন ৯.৮৫ সেকেন্ড। তারপর থেকে বুরেল বলার মতো কিছুই করতে পারেননি। এজন্য শুধু নিজের ওপরই নয়, তাঁর সমর্থকদের ওপরও ক্ষুব্ধ হন বুরেল। কারণ তাঁরা সবসময় বুরেলের কাছ

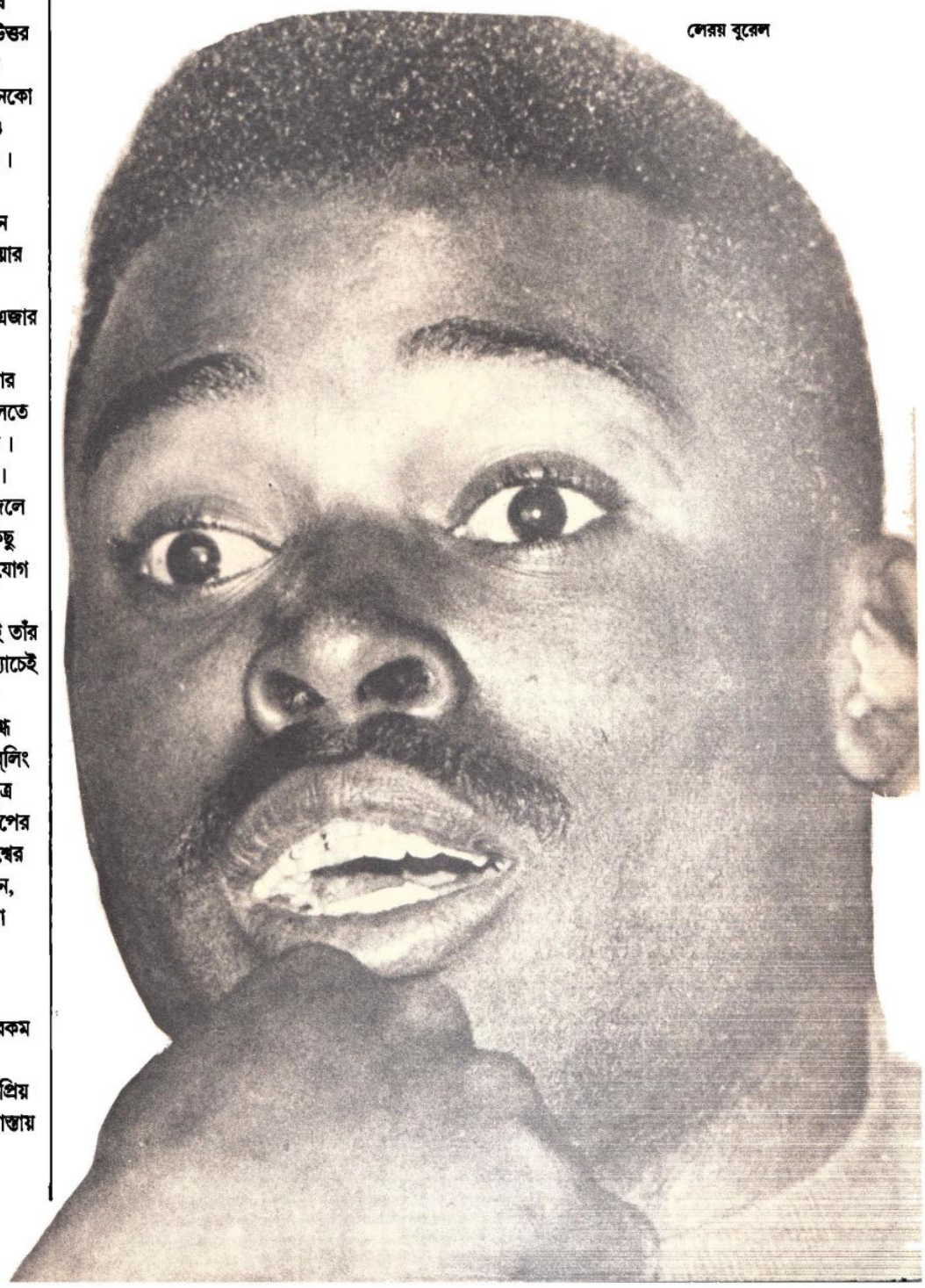

লেরয় বুরেল

থেকে শুধু বিশ্বরেকর্ডই আশা করেছিলেন। বুরেল বলেছেন, "এতে শুধু আমার ওপর মানসিক চাপই বেড়েছে এতদিন।" বুরেল জানিয়েছেন, "আমি এখন বিশ্বরেকর্ড নিয়ে ভাবছি না। আমার লক্ষ্য, এখন যারা ভাল দৌড়চ্ছে তাদের মধ্যে নিজের স্থান করে নেওয়া।" তবে বুরেল এও জানাতে ভোলেননি যে, তিনি এখন অনুশীলন করে তৈরি।.

আবার কোর্টে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে যথাসাধ্য করছেন মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। ২৯ জুলাই মোনিকার সঙ্গে ম্যাচ খেলবেন মার্টিনা, নিউ জার্সির মাহওয়াতে। একদা বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকাটির এই ফিরে আসার লড়াই যে একটি ঐতিহাসিক ম্যাচ হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

❑

মোনিকা সেলেস ❑

সি.বি.এস. টেলিভিশন নেটওয়ার্কের প্রধান কর্তা ডেভিড কেনিনের মতে, "এটি এই বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঐতিহাসিক একটা ম্যাচ হতে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে এটা আমরা প্রচার করব।" কেনিন ভুল বলেননি। আগামী ২৯ জুলাই মোনিকা সেলেস আবার কোর্টে নামছেন। দু' বছরের বেশি কোর্টের বাইরে ছিলেন সেলেস। এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা তাঁকে এতদিন কোর্ট থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ১৯৯৩-এর এপ্রিলে ছুরিকাহত হন সেলেস। পরবর্তীকালে অসাধারণ এই টেনিস তারকা শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে গেলেও মানসিকভাবে কিছুতেই বল ফিরে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে

ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ এনে দিলে কী হবে, প্রখ্যাত কোচ কার্লোস আলবার্তো পেরিরার ক্লাবের চাকরি কিন্তু গেল। গত মরসুমে স্পেনের ক্লাব ভ্যালেনসিয়ার দায়িত্ব নেন পেরিরা। সেরকম সাফল্য তিনি অবশ্য পাননি। এবার ক্লাবের অবস্থা আরও খারাপ। স্পেনের লিগে ভ্যালেনসিয়ার স্থান এবার দশম। নীচের দিকের দল অ্যালবেটির সঙ্গে ড্র করার পরই ক্লাবের চেয়ারম্যান প্যাকো রইগ পেরিরার হাতে বরখাস্ত হওয়ার চিঠি ধরিয়ে দেন। সরকারিভাবে যদিও ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত পেরিরার সঙ্গে ভ্যালেনসিয়ার চুক্তি, তথাপি পেরিরাও ওই ক্লাবের সঙ্গে আর যুক্ত থাকতে আগ্রহী নন। পেরিরা এখন চান

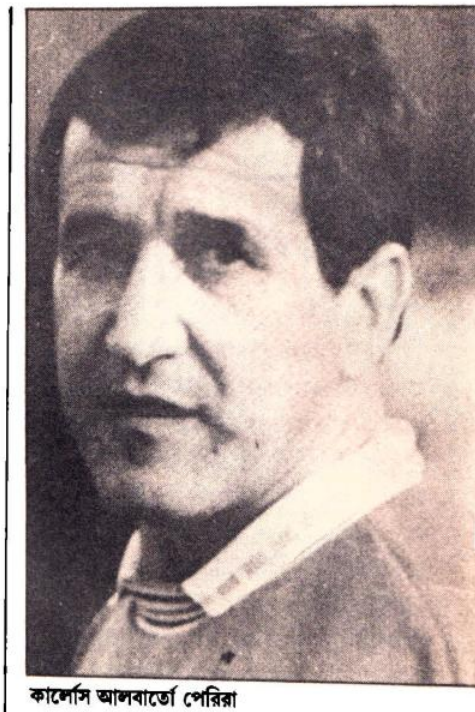

কার্লোস আলবার্তো পেরিরা

আমেরিকা দলটিকে প্রশিক্ষণ দিতে। আগেও পেরিরাকে আমেরিকার জাতীয় দলটি হাতে নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি এড়িয়ে যান এই বলে যে, "দলের প্রত্যেক ফুটবলার ভাল হলেও দলটি মোটেই পেশাদার নয়। এবং এদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।" এখন অবশ্য রাজি হয়েছেন পেরিরা। কী করবেন তিনি, বিশ্বকাপজয়ী কোচ তো আর বেকার থাকতে পারেন না!

❑

কলম্বিয়ার বিশ্বখ্যাত গোলরক্ষক রেনে হিগুইতা আবার জাতীয় দলে ফিরে এসেছেন। ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে দারুণ খেলে সকলের নজর কাড়েন হিগুইতা। গোল ছেড়ে নিজেদের অর্ধের মাঝমাঠ পর্যন্ত এগিয়ে যেতেন হিগুইতা। নিজেদের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের বল এগিয়েও দিতেন। গত বিশ্বকাপে হিগুইতাকে দলে রাখা হয়নি, কারণ তাঁর বিপক্ষে অনেক অভিযোগ ছিল। তাঁকে বাদ দিয়ে দল অবশ্য ভাল খেলেনি। জাতীয় দলের অধিনায়ক কার্লোস ভালদেররামাও সে-কথা স্বীকার করেন। তাঁর মতে, "হিগুইতা থাকলে আমরা অনেক ভরসা পেতাম।" এখন হিগুইতা ফিরে আসায় জাতীয় দলের শক্তি নিঃসন্দেহে বাড়বে। হিগুইতা নিজে বলেছেন, "দেশের হয়ে খেলতে আমার সবসময়ই ভাল লাগে। আর ভাল লাগে গোল না খেয়ে দেশের জয় দেখতে।"

দর্শক

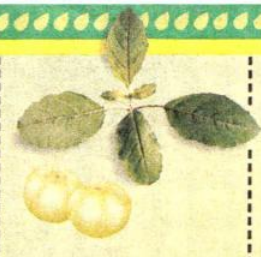

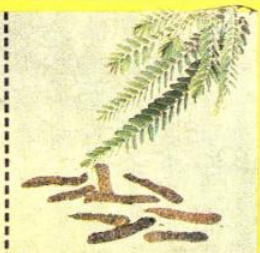

FOUNTAINHEAD- 1447-95